ভাবীকাল

প্রেমেন্দ্র মিত্র

রচিত

ছায়াছবির কাহিনী

জ্যোতিপ্রসাদ বসু কর্তৃক উপন্যাসান্তরিত

ভাবীকাল
প্রথম সংস্করণ
বৈশাখ, ১৩৫৩

—এক—

বংশ ত নয় যেন কোন আদ্যিকালের বুড়ো বট। মাথা ভর্তি কুচক্র আর কুমতলবের জট! মাথার ভারে পায়ের ভর থর থর করে কাঁপে। আর তাই চারদিকে বাহু বিস্তার করে বুড়ো বট আঁকড়ে ধরতে চায় শূন্যকে—আকাশকে; আঁকড়ে ধরে মাটিকে ঝুরি নামিয়ে নামিয়ে। বয়স তার যত বাড়ছে, পায়ের জোর যত কমছে ততই বাড়ছে তার ক্ষুধা, বৃদ্ধির উত্তেজনা।

অভিশাপ আর বিষ ঐ বটের মজ্জায় মজ্জায়। ঐ বট কেটে তুমি টুকরো করে নিয়ে এসো; তার থেকে বানাও আসবাব, দেখবে কোনদিন অলক্ষ্যে ঘুণ ধরেছে সেই কাঠে…সেই ঘুন ঝাঁঝরা করে দিয়েছে তার দেহ। এ ঘুণ আলাদা করে যে ধরে তা নয়, এ ঘুণ মিশে আছে, ওদের মজ্জায় মজ্জায়, বইছে ভেতরের যে প্রাণ-রস তার সঙ্গে। যত উচ্ছেদ করো আবার নতুন করে গজিয়ে ওঠে!

এমনই এক বংশের বংশধর শিবনাথ চৌধুরী! চৌধুরী বংশের একালে ছিল প্রাচুর্য আর সমারোহ। এখন ঝুরির জঙ্গল নেমেছে চারিদিকে; অংশীদার আর সরিকের সংখ্যা সেই বংশ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। সেই সঙ্গে সঙ্গে ধরেছে ঘুণ, বাসা বেঁধেছে সাপখোপ! এ ওকে ছোবল মারে, বিষ ঢেলে দেয় এ ওর গায়ে। সবার রক্তে মিশিয়ে আছে বিষ!

অতবড় তিনমহলা বাড়ীখানা সার্কাসের বুড়ো বাঘের মত ঝিমোয়। দাঁত পড়া রোঁয়া-ওঠা পঙ্গু বাঘ, কোনকালে তার যৌবন ছিল, বনে বনে

ডাক ছেড়ে বেড়াতো সে কথা ভুলেই গেছে সকলে। কী সে দিন ছিল সব। এক একটা ডাকে বনের চারদিক কেঁপে কেঁপে উঠতো··· ছুটে পালাতো যে যেখানে ছিল, এমন কি অনেক বড় বড় পশুরাও। আর আজ কি না লোম-খসা চামড়ার ফাঁকে ফাঁকে এতটুকু পোকারা অস্থির করে তুলেছে অতবড় বাঘটাকে। কিলবিল করছে পোকারা··· !

অতবড় বাড়ীখানার খোপে খোপে কিলবিল করছে চৌধুরী বংশের বংশধরেরা। এক এক মহলে এক এক তরফ; বড়, মেজ, ছোট; এক এক তরফে আবার এক একটা রাবণের বংশ ছড়িয়ে বসেছে···। দূর থেকে দেখে মনে হবে মৌমাছির চাকের মত। কিন্তু এক ফোঁটাও মধু পাবে না ওখানে খুঁজে পেতে। পাবে বিষ।···এ ওর গায়ে ঢালবার জন্যে মুখিয়ে আছে। কোথায় এক ফালি জমি ওর ভাগে চলে গেল এর দখল থেকে। এর গাছের ছায়া ওর জানলাকে ঢেকে দিল, এতেই কতবড় একটা কাণ্ড যে হয়ে যায় বাইরে থেকে কেউ বুঝতে পারে না। বুঝতে গেলে ওদের রক্তের খানিকটা মিশেল চাই তোমার রক্তের সঙ্গে। চাই ওদের মত সংস্কার।···

আসলে ঐ রক্ত ছাড়া ওদের কোন সম্বলই নেই। সেই পূর্বপুরুষের যে রক্ত-স্রোত একবার ছাড়া পেয়েছিল ধমনীতে সেই স্রোতের জোরেই ওরা এখনও চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। ঝগড়ার মাথায় সেই রক্তই গরম হয়ে মাথায় ওঠে। সেই রক্তই একজন অপর জনের মাথা ফাটিয়ে ছুটিয়ে দিতে চায়···। আবার সেই রক্তই দুশ্চিন্তা আর দুঃস্বপ্নের ভারে আগুন ধরায় ওদের শিরায় শিরায়।···এক কথায় সেই রক্ত নিয়েই ওরা বেঁচে আছে, তৈরী হয়ে আছে মরবে বলে। সেই রক্ত ছড়াচ্ছে ওরা ধাপে ধাপে। শিবনাথ ওদেরই একজন; ছেলে-বউ নিয়ে মাথা গুঁজে পড়ে আছে ওদের সঙ্গে আর দিন গুণছে। দিন গোণা ওদের রোজের কাজ। দিনগোণা মানে জীবনের দিন নয়,—মামলার দিন, দখল নেবার দিন···।

মায়া বলে, আর কতদিন এমন করে চালাবে, সেই ঝগড়া,··· মারামারি অশান্তি !···

শিবনাথ বলে, তুমি বোঝ না মায়া বাঁচতে গেলে এ সব চাই··· আমার চোখের ওপর ওরা জোর করে ভোগ করবে তা হতে পারে না—।···

—কিন্তু জোর করেই যে ভোগ করা যায় তা ত নয়। জোর ত' অনেক করেছো কিন্তু শান্তি কই ?···দিন দিন ত ঝগড়া বেড়েই চলেছে আমি দেখছি···।

—কিন্তু তুমি বুঝতে পারছো না মায়া ঐ উঠোনের ঐদিকটা ওরা যদি দখল করে তাহলে আমাদের নীচের ঘরটা কি রকম বেআব্রু হয়ে যাবে।

—হোক গে। সামান্য দুহাত উঠোন তার জন্যে পঁচিশ দিন হাঁটা-হাঁটি উকিল বাড়ী কোর্ট অত হাঙ্গামা তোমায় করতে হবে না।

—তুমি ত বলে দিলে হাঙ্গামা করতে হবে না। কিন্তু আজ নিচ্ছে দু'হাত উঠোন, কাল নেবে ঘর, তারপরদিন পুকুর······তারপর দাঁড়াবে কোথায়······

—যা আছে আমাদের তাই নিয়ে চুপ করে থাকলে কিসের আমাদের অভাব শুনি ?

—তুমি একেবারে ছেলেমানুষ। এতদিন ধরে বলছি তবু তুমি সামান্য জিনিষটা বুঝবে না।

—সত্যি তোমাদের ঐ বিষয়-বুদ্ধিটা ঠিক আমি বুঝি না······অথচ দেখছি শুধু শুধু ফতুর হয়ে যাচ্ছো দিন দিন······

—নিজের যেটা অধিকার তার জন্যে দেবে না লড়তে, তাহলে বিষয় থাকবে কি করে বল ?

—কিন্তু আমি আমাদের জন্যে ভাবি না, ভাবি আমাদের সোমনাথের জন্যে ওকে ত' মানুষ করতে হবে ······

—কার সঙ্গে যে কি বল তার ঠিক নেই। হচ্ছিল বিষয়ের কথা তার মধ্যে সোমনাথের মানুষ করার কথা এলো কি করে বুঝলুম না। আমার কি ইচ্ছে ও মানুষ না হয়।

—দেখো মিছামিছি রাগ কোরো না, আমি কি সে কথা বলছি।

আমি বলছি এই বাড়ীতে এই আবহাওয়ার মধ্যে কি মানুষ ও হবে বল দেখি ?

—তা এ বাড়ীর ছেলে এ বাড়ীতে মানুষ হবে না ত কি হবে রাস্তার লোকের কাছে ? কি যে বল তার ঠিক নেই।

—কেন কতদিন ত তোমায় বলেছি, চল আমরা এখান থেকে চলে যাই অন্য কোথায়······এ বাড়ী ছেড়ে ···

শিবনাথ হেসে ওঠে। বলে, তুমি বড় ছেলেমানুষ মায়া। এক এক সময়ে মনে হয় তুমি কেন এখানে এলে···এই বিষের হাওয়ার মধ্যে, যেখানে বাঁচতে গেলে চাই বিষ···চাই সাপের মত ফণা। আমিও কি শান্তি চাই না মায়া ?···মনের মত ঘর, গুছনো সংসার, নির্বিঘ্নে যেখানে হাঁফ ছেড়ে নিশ্বাস ফেলে বাঁচা যায়······কোন ভাবনা নেই······কেবল আমাদের ছোট্ট সংসার······যেখানে আমার এই পঁচিশ বছরের যৌবনকে আমি ভোগ করতে পারি······যেখানে আমার যৌবন বিষের জ্বালায় ছটফট করে মরে না। কিন্তু······উপায় নেই মায়া······উপায় নেই। এখানেই আমাদের বাঁচতে হবে। চৌধুরী বংশের ছেলে আমি, মাথা নীচু করতে ত পারবো না। আজ মামলা ঠুকেছে অবিনাশ ঐ দুহাত উঠোনের জন্যে আমিও দেখে নেবো কি করে ও দখল নেয়। সর্বস্ব দিতে পারি মায়া কিন্তু সম্মান দিতে পারবো না। দুহাত উঠোন······বেশী নয় এই দুহাত······এই দুহাত দিয়ে হুকুম চালিয়ে এসেছে শাসন করে এসেছে চৌধুরী বংশের পূর্ব পুরুষেরা······তার সম্মান আমায় রাখতে হবে।

—আচ্ছা ঐটুকু ত' জায়গা, ওটা ছেড়ে দিলেই ত হয় ওদের। কি আর লোকসান হবে তোমার।

—না না ওকথা বলো না তুমি। আমার মাথা গরম করে দিও না।

চৌধুরী বংশের রক্ত খেলা করছে শিবনাথের শিরায় শিরায়। যে রক্তকে সজল করে বাঁচে ওরা আর তৈরী হয় মরবে বলে। সেই রক্ত !

মামলায় হেরে বাড়ী ফিরে গুম হয়ে বসে রইলো শিবনাথ খাটের ওপর। বাবার মুখ দেখে ভয়ে এতটুকু ছেলে সোমনাথ তাড়াতাড়ি

ঘরের এককোণে জড়সড় হয়ে সেই যে বসে রইলো, পড়ায় মন না বসলেও নড়লো না সেখান থেকে। আর মায়া কি করবে ভেবে না পেয়ে যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে বার বার হিম হয়ে যেতে লাগলো।

শিবনাথ চেয়ে চেয়ে দেখছিল শূন্য দৃষ্টি মেলে কিন্তু কোন কথা বলে নি। অপমানে লজ্জায় বোবা আর অন্ধ হয়ে গেছে যেন! এ মামলায় হারা মানে অনেক কিছু হারানো। অনেক রোখ আর ভরসা করে সে অনেক টাকা ঢেলেছিল এর পেছনে কিন্তু তবু কি করে যে হেরে গেল শিবনাথ মনে মনে তারই হদিস খুঁজছিল। ক্ষতির পরিমাণটা বোধ করার পক্ষে তার মন তখন আড়ষ্ট হয়ে গেছে।

সম্বিৎ ফিরলো ও-বাড়ীর কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজে। মামলায় জিতে অবিনাশ মানত রক্ষা করবার জন্যে সিন্নী দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে সেদিনই। তারই বাজনা এ। সন্ধ্যে লাগতে না লাগতেই সুরু হয়ে গেছে ওদের উৎসব! ভক্তের ভগবান মুখ রেখেছেন!

এক একটা ঘড়ির হাতুড়ি পড়ছে আর শিবনাথের মাথার মধ্যে কিলবিল করে উঠছে বিষদন্ত বিষধরের ফনা!

—উঃ অসহ্য! চীৎকার করে উঠলো শিবনাথ। তাতে চমকে কেঁপে গেল সোমনাথের বুকখানা। আর আলমারীর গায়ে যে হাত খানা লাগিয়ে মায়া দাঁড়িয়েছিল নিষ্পন্দ হয়ে সেই হাতখানা ফস্ করে খসে গেল আলমারীর গা থেকে।

—দেখছো কি? জানালাগুলো বন্ধ করে দাও···বন্ধ করে দাও! পাগল করে দেবে একেবারে,।

ঝপ ঝপ করে জানালাগুলো বন্ধ করে দিলে মায়া। আওয়াজটা এক ঝটকায় স্তিমিত হয়ে গেলেও সমস্ত আনাচে কানাচে, প্রত্যেকখানা ইটে যেন একটা চাপা উপহাসের মত প্রতিধ্বনি গম্ গম্ করতে লাগলো।

সন্ধ্যের ঘোর লেগেছিল এর মধ্যেই, জানালা খোলা থাকায় বোঝা যায় নি। সোমনাথ বই মুড়ে মাথা গুঁজে বসলো। শিবনাথ মাথাটা টিপে ধরে শুয়ে পড়লো খাটের ওপর।

মায়া ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে বসলো শিবনাথের মাথার কাছে।

তারপর ধীরে ধীরে হাত বোলাতে লাগলো মাথায় কপালে। শিবনাথ কিছু বল্লে না, চোখ বুঁজে শুয়ে রইলো চুপ করে।

—উঃ কী গরম হয়েছে মাথাটা! শিউরে উঠলো মায়া।

—ও কিছু নয়। এখনও অনেক বাকী মায়া।

—কেন মন খারাপ করছো শুধু শুধু! সাহস পেয়ে মায়া একটু স্নিগ্ধ কণ্ঠেই বল্লে।

—না না মন খারাপ আর কেন করবো। কিন্তু জানো মায়া শিবনাথ চৌধুরী এখনও মরে নি···এখনও চেষ্টা করলে—

—আচ্ছা এখনও তুমি ভুলবে না? শুধু শুধু মাথা গরম করবে?

—শুধু—শুধু? তুমি একে শুধু শুধু বলবে তবু? এতবড় অপমান! তোমার একটুও লাগছে না?

—কিন্তু এর শেষ যদি না করতে পারো ত' কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বল ত'? এই রকম করে করে একটা অসুখ বানিয়ে বসলে—

—হুঁঃ অসুখ! অসুখ টসুখ নয় মায়া। আমি ভাবছি কি জানো—ভাবছি শেষটা তোমার কথাই সত্যি হল।

—আমার কথা? কি কথা? বলতে গিয়ে মায়ার গলাটা কেঁপে। উঠল সে ত' কোন অমঙ্গল আশঙ্কা করে নি। তবে?···ম্লান হাসিতে মুখখানা একটু শান্ত করে শিবনাথ বললেঃ তুমি বলেছিলে চল এখান থেকে আরাম চলে যাই। শেষ পর্যন্ত ভাবছি তাই যেতে হবে···।

—যাবে? যাবে? এই বাড়ীর অভিশাপ ছেড়ে—মায়ার কণ্ঠে প্রচণ্ড আগ্রহ।

—হ্যাঁ হ্যাঁ···এখান থেকে এই অপমানের বোঝার হাত থেকে পালিয়ে যাবো আমরা। জঙ্গল পার হয়ে আমাদের মধুবনীর তালুক—

—ওগো, কবে যাবে বল!

—কালই যাবো মায়া। এত বড় পরাজয়ের পর আর এখানে মুখ দেখাতে পারবো না···। বলতে বলতে শিবনাথ মায়ার প্রসারিত হাতখানা চেপে ধরলো।···তুমি কত কষ্ট পাচ্ছো মায়া, এখানে তোমার শান্তি নেই—

—শুধু আমি কেন, কষ্ট ত' তুমিও পাচ্ছো—শান্তি নেই—সুখ নেই···

—হ্যাঁ হ্যাঁ···তাইতো চলে যাবো আমরা। এখনও মধুবনীর তালুক আমার আছে, সেটা দিয়ে আর এক হাত দেখে নেবো মায়া এই পরাজয়ের শোধ নিতে পারি কি—না···

—শোধ নিয়ে আর কি হবে? তার থেকে মধুবনীতে গিয়ে আমরা নতুন করে ঘর বাঁধবো। আমাদের মনেই থাকবে না পেছনে কি অভিশপ্ত জীবন ছিল আমাদের···। আমাদের সোমনাথ বড় হয়ে উঠবে নতুন বাড়ীতে, যেখানে কোন বিষ নেই, হিংসে করবার মানুষ নেই···।

—কিন্তু এ অপমান যে আমি ভুলতে পাচ্ছি না মায়া···। জানো আমাদের বংশে পরাজয়ের অপমান কেউ কখনও মুখ বুজে সহ্য করে নি···।

—আচ্ছা সে দেখা যাবে। এখন ওঠো বাক্স বিছানা বাঁধতে হবে। এত দুঃখের মধ্যেও মায়া অত্যন্ত সহজ আনন্দে ভরে উঠেছে।

শিবনাথ এবার জোরে জোরে হেসে উঠলো। বললে, তোমার এই ছেলেমানুষীর জোরেই এ যাত্রা বেঁচে গেলাম মায়া!

—দুই—

মায়া মুক্তি পেল।

সাত পুরুষের বাড়ী ত' নয় যেন নিজের ঘরে বসেই দ্বীপান্তর! তার চারদিকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, জেলখানার পাঁচিলের মত। সে পাঁচিল জীবনের বিরুদ্ধে। গতানুগতিক অভিশপ্ত জীবনের ওপারে কালাপানীর মত কালাঝুরি জঙ্গল···তার ওদিকে আছে নতুন জীবনের হাতছানি···।

শিবনাথ এখন আশা রাখে মধুবনীর তালুকে গিয়ে বসতে পারলে আর একবার চেষ্টা করে দেখা যাবে···। চৌধুরী বংশের আদিম রক্ত নেচে বেড়াচ্ছে তার ধমনীতে···

দানবের মত কালাঝুরি জঙ্গলটা। সমস্ত অন্ধকারের কালো যেন ঝুর ঝুর করে ঝরে জমাট হয়ে গেছে তার বুকের মধ্যে, এমনি ঘন অন্ধকার বন। জঙ্গলের ধার দিয়ে পিয়ালী নদী, বাঁকে বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেছে দিগন্তে। চকচকে জলের আয়নায় দিনে-রাতে চন্দ্র-সূর্য মুখ দেখে, হাজারো টুকরোয় ঝলমল করে ওঠে তার দেহ। দানব জঙ্গলটার পাশে বন্দিনী রাজকন্যার মত দেখায় নদীটাকে।

নদীর ধারে ধারে বাসা বেঁধে আছে কয়েক ঘর জেলে পরিবার। জীবনে যাদের দাবীদাওয়ার অরণ্য নেই আছে শুধু ঝির ঝিরে নদীর মত শান্ত স্রোত, যা খেয়াল-খুশির আলোতে ঝলমল করে, কূলে কূলে উথলে ওঠে,—এমনই সহজ সরল খোলা জীবন যাদের। পথে মায়া হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ায় বাধ্য হয়ে শিবনাথকে এদের মধ্যে আশ্রয় নিতে হয়েছে। শিবনাথ তাড়াতাড়ি এখান থেকে মধুবনী যাওয়ার জন্যে ব্যাকুল, কিন্তু অসুখের মধ্যেও মায়ার কেমন এই জায়গাটি

বড় ভালো লাগে, এমন নিরবচ্ছিন্ন শান্তি সে জীবনে কখনও পায় নি। শিবনাথ ব্যস্ত হয়ে উঠলে সে বলে কেন তুমি ব্যস্ত হচ্ছ, আমরা শান্তি চেয়েছিলাম একদিন মনে আছে? শিবনাথ একটু চুপ করে থেকে বলে, এখানে ত' আমাদের বেশী দিন থাকলে চলবে না। আমাদের আরও কাজ আছে। মধুবনীর তালুকে আমাদের যেতে হবে, তারপর—

—কেন? মধুবনীর তালুক নিয়ে তুমি কি এর চেয়েও সুখী হবে?

—সুখ? সুখ কোথায় আছে জানি নে। কিন্তু আমাকে জয়ী হতে হবে মায়া……সেটাই আমার কাছে বড় কর্তব্য।

—কিন্তু মধুবনীতে গিয়ে আবার সেই মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়লে অশান্তি বাড়বে……তাতে তোমার শরীর ভেঙ্গে পড়বে…

—তুমি কেন তা ভাবছো মায়া? আমি কি ভাবছি জানো? ভাবছি মধুবনীতে গিয়ে বসতে পারলে দেখবে আমাদের সংসারে শ্রী ফিরে এসেছে……মেঘ কেটে গেছে —

—তার চেয়ে এখানে যদি ভাল করে একটা গ্রাম গড়ে তুলতে পারো এই সহজ সরল মানুষগুলোকে দিয়ে, তাহলে এরাও বাঁচে আর আমাদেরও শান্তি থাকে……দেখো না চেষ্টা করে। এরা আমাদের যেমন ভালবাসে তাতে আমার মনে হয় চেষ্টা করলে খুব হবে……এখানেই মধুবনী গড়ে উঠবে…

—কিন্তু সে যে অসম্ভব কল্পনা মায়া। এই জঙ্গল পরিষ্কার করে গ্রাম গড়ে তোলা সে যে অনেক টাকা লোকজনের ব্যাপার…

—কেন? টাকা কি তোমার নেই? যে টাকা দিয়ে মামলা করতে যাচ্ছিলে সেই মধুবনীর তালুকের টাকা—

শিবনাথ হাসে। তোমার ঐ ছেলেমানুষী মনটা যদি সত্যিকারের জগতের সঙ্গে মিলে যেতো, তাহলে মায়া—তোমার স্বপ্ন যদি সত্য হয়ে উঠতো…

কিন্তু মায়া জানে স্বপ্ন এ নয়, এ হল ধ্যান! স্বপ্ন আসে ঘুমের অবচেতন অরণ্যে কিন্তু ধ্যানের পথ জাগ্রত নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে—আলোর মধ্য দিয়ে।

শিবনাথের মনে নিরন্তর দ্বন্দ্বের কালবোশেখী গর্জায়।

মানুষের একটা বড় আশীর্বাদ যে সে হাঁপিয়ে উঠতে জানে। এক-ঘেয়েমীর মধ্যে থেকে কখন যে অবসাদ থিতিয়ে পড়ে ধরা যায় না গোড়ার দিকে। কিন্তু প্রতিক্রিয়া আসে……অবসাদ আসে। মানুষের মন আপনা থেকেই পিছলে পড়ে এক থেকে অপরের ওপর, যেমন করে সূর্যের রোদ্দুর ক্রমে ক্রমে গ্রাস করে একদিক থেকে অপর দিক, পূর্ব থেকে পশ্চিম। শিবনাথেরও এমন করে টান লেগেছিল অলক্ষ্যে নিজের রোখ থেকে মায়ার কল্পনার দিকে। নিজের জেদের দিকে ঘনিয়ে আসছে ছায়া।

এমনটা হবার প্রধান কারণ ঐখানকার বাসিন্দা ঐ জেলেরা। মানুষের উপদ্রব থেকে বাঁচবার জন্যে মানুষের ভীড় থেকে পালিয়ে এসে আর এক মানুষের—ভীড় না হলেও দলের মধ্যে পড়ে এত নিশ্চিন্ত বোধ করতে লাগলো ওরা, যে অবাক হয়ে গেল মনে মনে : অশিক্ষিত অপুষ্ট মানুষের দল, যাদের সঙ্গে তথাকথিত সভ্যতার কোন যোগ নেই প্রাত্যহিক জীবনে। সেই মানুষের দল এমন আপনার করে, তাদের গ্রহণ করবে—যেমন করে মাটি গ্রহণ করে বৃষ্টির জলকে, শিবনাথ তা আগে কোনদিন ভেবে দেখে নি। তাই ওদের দলের পাণ্ডা সাধন যখন বলেছিল, ভয় কি দা'ঠাকুর আমি ত রইলাম তোমার ভাবনা কি… এখানে থাকো……তবে আমরা হলুম গিয়ে ছোটলোক যদি দোষ ত্রুটী হয় ত ক্ষমাঘেন্না করে নিও……শিবনাথ তখন নিশ্চিন্তে বিশ্বাস করতে পেরেছিল এই অপরিচিত হঠাৎ-চেনা লোকটিকে।

সেই থেকে লক্ষ্মণের মত সঙ্গী হয়ে রয়েছে সাধন জেলে। দেখা শোনা করছে সোমনাথের…।

নতুন সূর্যের আলো পড়ছে শিবনাথের মনে, কিন্তু এই প্রভাতে—সূর্যকে হঠাৎ একটুকরো খুব কালো মেঘ এমন করে ঢেকে দেবে কে জানতো ?…

কে জানতো এর মধ্যে মারা যাবে মায়া—

হঠাৎ অসুখ তার অত্যন্ত বেড়ে গেল। শিবনাথ পাগলের মত হয়ে উঠল। এই জঙ্গলে কোথায় ওষুধ, কোথায় ডাক্তার।

কিন্তু তবু সাধন জেলে চেষ্টার ত্রুটি করলেনা। লোক পাঠালে আশে পাশে ডাক্তারের খোঁজে। কিন্তু সকলেই ফিরে এল ব্যর্থ হয়ে। এই বন বাদাড়ে কে আসবে?

সাধন বল্লে, আমি নিজেই তাহলে যাই দা' ঠাকুর। দেখি জঙ্গল বলে কোন ডাক্তার না আসে? না এলে পিছমোড়া করে বেঁধে আনবো না?···

এত অসুখের মধ্যেও মায়া তাকে ডেকে বল্লে, থাক্ সাধন! আর আমার ডাক্তারের দরকার নেই।

শিবনাথ ব্যথিত স্বরে বল্লে, এ সব কি বলছো মায়া? কি এমন হয়েছে তোমার! শিবনাথ মায়ার মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন।

শিবনাথের হাতটা ধরে মায়া বল্লে, না কিছু ত' হয় নি। কিন্তু কি দরকার আর ডাক্তারের, তুমি ত রয়েছো!

আমি থেকেই বা কি করতে পারছি মায়া। তুমি কষ্ট পাচ্ছো আর আমি নিরুপায় হয়ে বসে বসে দেখছি—

—না কষ্ট আমার হয় নি ত!···

—আর কত নীরবে সহ্য করবে মায়া···? এই জঙ্গলের মধ্যে—

—কিন্তু মানুষের জঙ্গল যে ছেড়ে আসতে পেরেছি তাই আমাদের ভাগ্য! তাই বোধ হয় আমাদের সোমনাথ মানুষ হয়ে উঠতে পারবে! অশিক্ষিত সাধন ওর কাছেই আসল শিক্ষা হবে তার···আমি হয়ত দেখতে পারবো না, তুমি দেখবে···

—আঃ কি সব বলছো মায়া! কি তোমার হয়েছে? দুদিন বাদে সেরে উঠবে তুমি···তারপর আমরা মধুবনীতে গিয়ে ঘর বাঁধবো··· আবার নতুন করে ঝাঁপিয়ে পড়বো জীবন-যুদ্ধে তুমি আমায় উৎসাহ দেবে···। তোমাকে যে বাঁচতেই হবে, নৈলে কিসের জন্যে আমি আর লড়বো? মিথ্যে মামলায় আমাদের সব গেছে, তাকে আবার জয় করে নিতে হবে যে···

—আচ্ছা আমার একটা অনুরোধ রাখবে? বল? আমার কথা শুনবে?···মায়ার স্বর অদ্ভুত রকমে করুণ!

—বল মায়া! তোমার কথাকে আমি ত কোনোদিন উপেক্ষা করি নি···

—সে আমি জানি। তাই ত' বলছি ঐ মামলার কথা ভুলে যাও! মারামারি কাড়াকাড়ি করে সেই চোখের জল আর অভিশাপের বিষ-মাখানো বিষয় উদ্ধার করে লাভ কি? সেখানে কোনদিন ত শান্তি পাবে না! তার চেয়ে—বরং

কথাগুলো বলতে মায়ার কষ্ট হচ্ছিল তাই শিবনাথ তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলে উঠলো: অত কথা বোলো না মায়া! তোমার কষ্ট বাড়বে!···

—না না আমায় বলতে দাও। মায়ার মুখ একটা অতীন্দ্রিয় আলোকে মধুর হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে শিবনাথের মুখের পটভূমিতে কোন এক ভাবীকালের ছবি দেখেছে সে···। আমায় বলতে দাও···আজ আমায় বলতে দাও···অনেক কথা আমায় বলতে হবে··· আমার কোন কষ্ট হবেনা। এখানে আমি খুব শান্তিতে আছি। আরো আগে যদি এখানে আমায় নিয়ে আসতে···তাহলে এখানেই আমি ঘর বেঁধে থাকতাম! এখানকার লোকেরা এখনো হিংসে করতে, লোভ করতে শেখে নি···এখনও তারা সবাই সবাইকে ভালবাসে···। মানুষ যদি এমন শান্তিতে থাকতে পারতো!···

—তুমি শান্তি পেয়েছো মায়া?···শিবনাথের স্বর গাঢ় হয়ে আসে। যাক্ আমার একটা আফশোস কেটে গেল!···

—একটা কেন তোমার সব আফশোস কেটে যাবে, লক্ষীটি এখান থেকে তুমি যেয়ো না···। তুমি বলেছিলে মানুষের জঙ্গল থেকে আমরা পালিয়ে বেঁচেছি···এবারে এই জংলী মানুষদের সঙ্গে প্রাণখুলে বাঁচো···। সত্যি এমন একটা জায়গা তৈরী করতে পারো যেখানে মারামারি নেই, স্বার্থ নেই, হিংসে নেই···যেখানে মাথা উঁচু করে তাকাতে মানুষ ভয় পায় না···এমনি একটা জায়গা তৈরী করতে পারো যেখানে ভাবী কালের নতুন মানুষেরা··· তোমার আমার সোমনাথের মত শত শত মানুষ প্রাণখুলে বাঁচবে···শান্তি পাবে—

—তিন—

শান্তির স্বপ্ন দেখতে দেখতে পরম শান্তির স্বপ্নের মাঝে ঘুমিয়ে পড়েছিল মায়া শিবনাথের কোলে মাথা রেখে।

তারপর থেকে শিবনাথ যেন বদলে গেছে।

পিয়ালী নদীর এক ধারে মায়ার শেষ শয্যা বিছানো হয়েছিল। শয্যার শেষ আগুন নিভে গেছে কিছুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু স্মৃতি তার জ্বলছে আগুণের মত······জ্বলছে তার শেষ কথা—এমন একটা জায়গা তৈরী করতে পারো যেখানে হিংসা নেই, স্বার্থ নেই, দ্বেষ নেই যেখানে মানুষ মানুষকে ভালবাসে······মানুষ মাথা তুলে তাকাতে ভয় পায় না···

শিবনাথ মাথা তুলে তারায় ভরা আঁধার রাতের আকাশের দিকে তাকায়। দেখে লক্ষ তারার উজ্জল চোখে মায়ার সেই স্বপ্ন জল জ্বল করছে।

শিবনাথের পা দুটো আড়ষ্ট হয়ে আসে, যে পা-দুটো সম্বল করে জঙ্গল পার হয়ে মধুবনীর তালুকে যাবার ক্ষীণতম আশা তাকে ব্যস্ত করছিল। সেই আশাও যেন মিলিয়ে গেল ভোরের আলোর তাড়া খাওয়া শেষ রাত্রির অন্ধকারের মত!

ছোট্ট সোমনাথ বলে, আমরা এখান থেকে কবে যাবো বাবা?

শিবনাথ কি জবাব দেবে খুঁজে পায় না! আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে ঐ তারাগুলোর মধ্যে যেন হাতড়ায়!

সাধন বলে, বুঝেছো দা'ঠাকুর তেনায় শান্তি চেয়েছিলেন, তা শান্তি তাঁর এখানে মিলবে······খুব শান্তি মিলবে।

—তোমার কথাই সত্যি হোক সাধন!

—একবার যে দা'ঠাকুরের পায়ের ধুলো পড়েছে এই আমাদের ভাগ্যি! এই জংলা দেশে তোমাদের আর ধরে রাখতে পারবো না। তবে একটা কথা বলে রাখি দা'ঠাকুর, যেখানে থাকো মনে রেখো যদ্দিন এই সাধন জেলের হাড় কখানা আছে, তদ্দিন তেনার শান্তির বিঘ্নী কখনো হবে না। তোমাদের ধরে রাখতে পারবো না, তবে যাঁকে রেখে গেলে তেনার জন্যে ভাবনা কোরো না দা'ঠাকুর কিছু ভাবনা কোরো না···। অন্ধকারের মধ্যেই সাধনের নির্বোধ চোখে বিশ্বাসের জল চিক চিক করে।

সোমনাথ বলে, আমরা কবে যাবো সাধন কাকা?

সাধন বলে, তাই তো বলছি, ব্যবস্থাটা ত' করতে হবে দা'ঠাকুর··· তোমাদের যাওয়ার ব্যবস্থাটা—

এদের শেষ কথাগুলো শিবনাথের কানে পৌঁছে ধাক্কা খেয়ে ফেরৎ আসে ঢেউয়ের মত। শিবনাথ তারাগুলোর দিকে নির্বাক দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে আরও দূরের কিছুকে যেন প্রত্যক্ষ করছে···ঠিক যেমন করে শেষ দিনে মায়া চেয়েছিল শিবনাথের চোখের তারা দুটোর দিকে—

আকাশের তারাগুলোও কি দেখছে না শিবনাথের দিকে?

অনেকক্ষণ পর শিবনাথ বলে, আমাদের এ জঙ্গলের মালিক কে বলতে পার সাধন?

—আজ্ঞে মালিক ভূষণার দশ আনির বড় তরফ। তবে মালিক বছরে একবার খাজনা আদায়ের বেলা, নৈলে আমরা মরলাম কি বাঁচলাম বছরের মধ্যে সে খোঁজও রাখেন না। হুঁঃ মালিক! মালিক বল তাকে?···

শুধু রেষারেষি মারামারি,···এ ছাড়া মানুষ কি আর কিছুই জানে না?···সুখে শান্তিতে সবাই মিলে মিশে থাকবার মত একটা জায়গা কি এত বড় পৃথিবীতে নেই?

ভাবতে ভাবতে শিবনাথের চোখ দুটো এক বিচিত্র আলোয় উজ্জল হয়ে ওঠে।

অন্ধ অন্ধকারের মধ্যেও যেন ঝিলিক দিয়ে ওঠে সেই জৌলুস!

*　　　*　　　*　　　*

দশানির জমিদার ষোড়শীকান্ত রায় দশদিক না হলেও একদিক আলো করে যে বসে আছেন সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই। সে দিকটায় বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে নায়েবমশায় ঘোষাল, আর শিরোমণিকে। ওদের অপর দিকে বসে আছে স্থানীয় পাঠশালার মাষ্টার মনোহর। ষোড়শী রায় বসে বসে তামাক খাচ্ছেন আর মনে হচ্ছে তামাকের হালকা ধোঁয়ার মতই জীবনটাকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছেন খেয়ালখুশিমত। মুখ চোখে সেই ভাবটা অত্যন্ত প্রকট!

এরই মধ্যে অতি সামান্য বেশে শিবনাথ এসে যখন ঢুকলেন কে বলবে ইনি মধুবনীর ছোট তরফের মালিক—শিবনাথ চৌধুরী!

শিবনাথ আসতেই শিরোমণি পরিচয় করিয়ে দেয়—উনিই দশানির ষোড়শীকান্ত রায়, বাবুর কাছে আপনার আর্জি পেশ করুন—বলতে বলতেই নিজের হাতদুটো একবার জোড় করে ইঙ্গিত করে বাবুর দিকে। তার ভাবার্থ এই যে একবার বাবুর পায়ে লুটিয়ে পড়া উচিত!

শিবনাথ হাত-তুলে বলেন, নমস্কার! শিরোমণির দিকে ভ্রূক্ষেপও করে না, চোখে মায়ার ঘোর তখনও তার কাটে নি।

বসুন আপনি।

শিবনাথ মনোহরের দিকটায় গিয়ে বসেন। ওর চোখে মুখে কি একটা অব্যক্ত বাণী যেন উন্মুখ হয়ে ওঠে।

নায়েব মশাই বলে, আপনার পরিচয়?...

শিবনাথ বলেন, আমার পরিচয় দেবার মত কিছু নয়! আপনাদের কাছে আমি একটু প্রার্থী হয়ে এসেছি।

ওঃ। তা বলুন আপনি কি বলতে এসেছেন।

ওদিক থেকে ঘোষাল সায় দিয়ে ওঠে: হ্যাঁ হ্যাঁ সাহস করে বলে ফেলুন মশায়, আমাদের বাবু সে রকম নয়। আমীর হোক, ফকির হোক বাবুর দরজা সকলের জন্য খোলা—। বলতে বলতে ঘোষাল হাত দুটো ফাঁক করে খোলা দরজার বিস্তৃতিটা পরিচয় দেবার চেষ্টা

করে। তার সেই রোগা রোগা হাত দুটো ছড়াতে গিয়ে বুকের হাড়-গুলো পর্যন্ত ঠেলে ওঠে।

শিরোমণি বলে, দরজা নয় ঘোষাল, দরজা নয়—দিল! এমন দরাজ দিল্ কোথায় পাবে?

জমিদার একবার তামাকের নলটা অধরচ্যুত করে খানিকটা উদ্গত ধোঁয়ার সঙ্গে ভক্ করে বলেন, আঃ তোমরা এঁর কথা শুনতে দেবে?

শিবনাথ অবসর পেয়ে কাজের কথাটাই উত্থাপন করে বসেন। দেখুন, আমি আপনাদের কালাঝুরির জঙ্গলী তালুক সম্বন্ধে একটু জানতে এসেছিলাম।

নায়েবমশাই হাতের তেলোর ওপর অন্যহাতের আঙ্গুল দিয়ে রেখা টেনে বলে, আজ্ঞে হাঁ—ওই যে পিয়ালী নদীর ধারে আমাদের প্রতাপসিং পরগণার এলাকার পাশে—তা আপনি কি জঙ্গল জমা নিতে চান? মশাই কাঠের কারবার করেন বুঝি?

—আজ্ঞে না, কোন কারবারই করি না।

জমিদার বলেন, তবে?

শিবনাথ বলেন, আমি ঐ তালুকটা ইজারা নিতে চাই!

—ইজারা নিতে চান? উদ্দেশ্য?

—উদ্দেশ্য নয়, বলুন আশা! শিবনাথের স্বর শান্ত অথচ কঠিন। আশা মস্ত বড়। সুখে স্বচ্ছন্দে মানুষ বাস করতে পারে এমন একটা গ্রাম ওখানে বসাবো······আর গ্রামই বা কেন? বলতে বলতে শিবনাথের চোখ কিসের আলোয় উজ্জল হয়ে ওঠে।······ শুধু গ্রামই বা কেন? একটা নগর হয়ত ওখানে গড়ে উঠবে······যেখানে মানুষ মাথা উঁচু করে তাকাতে ভয় পায় না ···

দিনের আলো হলেও শিবনাথ রাতের আকাশে বড় বড় উজ্জল তারাগুলোকে দেখতে পাচ্ছেন যেন চোখের ওপরে।

তারপর একটু সামলে নিয়ে বলেন, হাঁ আপনাদের ওটাতো অনাবাদী······পতিত!

নায়েব মশাই একটু যেন শ্লেষ করেই বলে, হাঁ নগর বসাবার ঠিক

উপযুক্ত জায়গা! তা আপনার ন ভূত ন ভবিষ্যতি নগরটি কেমন করে বসাবেন ভেবেছেন?

—তা ত' এখনো জানি না।

জমিদার বলেন, যে সব গ্রাম নগর আমাদের আছে তাতে বুঝি আপনার মন ওঠে না?······ সেগুলোর অপরাধ?

শিবনাথকে প্রশ্নটা করা হলেও তাকে জবাব দেবার সুযোগ না দিয়েই মনোহর মাষ্টার উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠে, অপরাধ কি আপনি জিজ্ঞাসা করছেন রায় মশাই! পিঁপড়েও মাটির তলায় গর্ত করে, উই পোকাও ঢিবি গড়ে কিন্তু বিধাতার শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ হয়ে আমরা তাদের চেয়েও অধম! আমরা কি এখনো বাঁচতে শিখেছি, রায় মশাই?

বলিষ্ঠ চেহারার মানুষ এই মনোহর। বড় বড় চোখে বিশালতার একটা দীপ্তি প্রথমেই নজরে আসে। কথার উত্তেজনায় শরীরের প্রতিটি কুঞ্চনে একটা উন্নত প্রাণের রেখা পড়ছে যেন! শিবনাথ এতক্ষণে লোকটিকে ভাল করে দেখলেন।

মনোহর থামে নি তখনও,—যেমন আমাদের মন, যেমন আমাদের সমাজ—তেমনি আমাদের সহর। না আছে শ্রী না ছাঁদ না শৃঙ্খলা। আমরা একসঙ্গে জোট বেঁধে থাকি শুধু খাওয়া-খাওয়ি, মারা-মারি কাটা-কাটি করবার সুবিধের জন্যে—বাড়ীতে দেয়াল তুলি প্রতিবেশীকে দূরে রাখবার জন্যে—ঘরে দরজা দিই খুলে বেরুবার জন্যে নয়, খিল দিয়ে লোকের আসা বন্ধ করার জন্যে······আমাদের সহর ত সহর নয়—মাটির ওপর বিরাট এক বিষফোড়া। তবু এর অপরাধ কি আপনি জিজ্ঞেস করছেন?

ঘোষাল তার বড় বড় চোখ দুটো ঈষৎ টিপে বলে, বাহবা! মনোহর মাষ্টের এবার ঠিক মনের মত কথা পেয়েছো······কেমন?

মনোহর বলে, মনের মত কিনা জানি না ঘোষাল, তবে মনের কথাটা যে বলতে পেরেছি তাতে কোন সন্দেহ নেই। যা সত্যি তা তুমিও দেখছো, আমিও দেখছি আর রায় মশাইও দেখছেন······কিন্তু সত্যি কথাটা চেপে রেখে মনকে ভুলিয়ে রেখে লাভ কি বলতে পারো?

শিরোমণি প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, তা মাষ্টার! এখানকার পাঠশালার ছেলেগুলোর মাথা না খেয়ে তুমি ওঁর সঙ্গে এই নগর গড়ার কাজেই কেন লেগে যাও না? এই তো তোমার মনের মত কাজ!

ঘোষাল তাড়াতাড়ি যোগ দেয়, বাবুর কাছে হাত পাতলে এমন দু'দশ বিঘে জমি এমনিই পেতে পার! বাবু আমাদের কল্পতরু!

বাবু একটু বিরক্ত স্বরে বলেন, তোমরা একটু থামবে? তোমাদের জ্বালায় কোন কাজ করবার যো কি নেই!

নায়েব মশাই তাড়াতাড়ি কাজের কথা পেড়ে বসে। বলে, তা আপনি গ্রামই বসান আর নগরই গড়ুন তালুক ইজারা নিতে হলে একটা লেন-দেনের ব্যাপার আছে তা বোধ হয় জানেন?

—আঁজ্ঞে তা জানি বই কি। সেইজন্যেই ত এখানে এসেছি। আপনারা যা চান আমার সাধ্যের অতিরিক্ত না হলে আমি তা দেবার চেষ্টা করবো।

—তা আপনার সাধ্যটা কতটুকু তা আগে জানতে পারলে ভাল হতো না কি? মন্ত্রীর কুঞ্চিত ঠোঁটের ফাঁকে একটুখানি বাঁকা-হাসির আভাস দেখা যায়।

শিবনাথ সমান শান্তস্বরে বলে চলেন, সাধ্য আমার এমন বেশী কিছু নয়—মধুবনীতে সামান্য কিছু জমিজমা আছে আশা করি তা থেকে আপনাদের পাওনা মেটাতে পারবো।

ষোড়শীকান্ত তামাকের শেষ ধোঁয়াটুকু ছেড়ে একটু উঠে বসে বলেন, আপনি মধুবনীর—

আঁজ্ঞে ছোট তরফের—আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে শিবনাথ কথাটা শেষ করে ষোড়শীকান্তের দিকে তাকায়।

এক ফুঁয়ে আলো নিবিয়ে দেবার মত থমথমে অবস্থা ঘরে।

নায়েব মশাই বলেন ও, আপনিই ছোট তরফের শিবনাথ চৌধুরী. এতক্ষণ বলতে হয়।

ষোড়শীকান্ত বলেন, তা মধুবনীতে নিজের জমিদারি ছেড়ে এই বনদেশে এসে বসতে চাইছেন কেন?…

একটু হেসে শিবনাথ বলেন, বললাম ত' মানুষের সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করবার মত একটা গ্রাম বসাতে চাই··· ।

ষোড়শীকান্ত চোখে মুখে একটা গভীর উপহাসের চাপা ভঙ্গী ফুটিয়ে তুলে বলেন, ও ! তা যেমন আপনার অভিরুচি !

নায়েব মশাই বলেন তা আসুন আপনি আমার সঙ্গে সেরেস্তায়··· সেখানেই সব ব্যবস্থা হবে··· । বলতে বলতে এক হাতের তালুর ওপর অন্য হাতের আঙ্গুল দিয়ে দাগ কেটে হিসেবের একটা ইঙ্গিত দিতে চেষ্টা করেন ।

শিবনাথ মন্ত্রীর সঙ্গে এগিয়ে যান ।

ওদের দিকে মনোহর এগিয়ে আসে । বলে, আচ্ছা শিবনাথবাবু যদি না কিছু মনে করেন আপনার সঙ্গে আমিও কি একটু যেতে পারি ?···

—একটু কেন মনোহর বাবু যেতে হলে অনেক দূর যেতে হবে আপনাকে ।

—সে ত হবেই শিবনাথ বাবু ।

ঘোষাল চোখদুটো বড় বড় আর গোল গোল করে বলে, সে কি মাষ্টার ? তুমি সত্যিই চললে নাকি ?

—তাইতো চললাম ঘোষাল । এমন সুযোগ পেয়েও যদি না যাই তা হলে সারা জীবনেও যে আপশোষ ঘুচবে না ! শিরোমণি বলে, কিন্তু তোমার পাঠশালা ?

—পাঠশালা ত' আমার সঙ্গেই চললো ঘোষাল, আমার পাঠশালা পৃথিবীময় ছড়িয়ে আছে···আমি শুধু গিয়ে বসতে পারলেই হয়···

মনোহর মাষ্টার হেসে শিবনাথের সঙ্গে বেরিয়ে যায় ।

— চার —

কুড়ুল চলছে।

কত যে কুড়ুল তার সংখ্যা নেই। কত বচ্ছরের জঙ্গল এই কালাঝুরি, একে কেটে সাফ্ করে দেওয়া হবে। দূর হবে কত বচ্ছরের পুঞ্জীভূত জমাট অন্ধকার। কাটা গাছের ফাঁকে ফাঁকে নতুন আলোর রোদ্দুরে-শানানো চাবুক এসে পড়ছে ডেলা ডেলা অন্ধকারের স্তূপে। আবার সেই আলো লেগে ঝল্‌সাচ্ছে কুড়ুলের লোহাটা। আর সেই সঙ্গে চক্‌চক্ করে উঠছে যারা কাটছে তাদের লোহার মত কালো আর শক্ত ঘামে-ভেজা শরীরগুলো···।

সত্যিই যে তার স্বপ্ন সত্যি হবে এমন করে—শিবনাথ আবিষ্টের মত বসে বসে চেষ্টা করছেন সেটা ধারণা করবার, বিশ্বাস করবার।

বড় বড় বনস্পতির দল, যারা এতদিন নির্বিরোধে অন্ধকারের সঙ্গে গোপনচুক্তি করে বাসা বেঁধে বসেছিল, সেই উদ্ভিজ্জের দল ধাতব শক্তির আঘাতে মড়মড় করে ধ্বসে পড়ছে, রেগে ফুলে পরাজয়ের গ্লানিতে আহত দানবের মত লুটিয়ে পড়ছে, প্রাণ দিচ্ছে,—রাম রাবণের যুদ্ধে এমনি করে এক একটি রাক্ষস বোধ হয় ভূমিশয্যা গ্রহণ করেছিল···।

মানুষের শুভ-ইচ্ছা আর শুভ-শক্তির ঝড় লেগেছে এই কালোঝুরির জঙ্গলে। অনেক বড় বড় ঝড়ে যারা মাথা বাঁচিয়ে ছিল সেই সব মহীরুহ নির্বিবাদে হার মানছে, লুটিয়ে পড়ছে···।

এমনি করে ঝড় যদি উঠতো মানুষের মন আর সমাজের অরণ্যে, যত হিংসা, দ্বেষ, পাপ আর সংস্কারের ঘন বন জটলা পাকিয়েছে তারা এমনি করে লুটিয়ে পড়তো···ঘুমিয়ে পড়তো চিরদিনের মত। তারপর

মুক্তি পেতো তাদের পায়ের নীচেকার দাবানো মাটি—মুক্তি পেতো আলোর নীচে···। সেই শূন্য মাটি আসন্ন নতুন ফসলের বুভুক্ষায় হলদে হয়ে কুঁচকে যেতো···। ধূ-ধূ করতো!

কে যেন চাপা পড়ে গেল পড়ন্ত একটা গাছের নীচে। সাধন হাঁ-হাঁ করে ছুটে এল, 'গেল' 'গেল' রব তুলে।

মনোহর বললে, লক্ষণটা কিন্তু ভাল নয় শিবনাথবাবু। শুভকাজের গোড়াতেই বাধা···প্রাণে বাঁচলেও পা'খানা ছেঁচে গেছে বোধ হয় একেবারে···।

শিবনাথ বললেন, বিনা বাধায় কোথাও কোন ঘা না খেয়ে সত্যিকার বড় কাজ কি হয় মনোহরবাবু? এ ত' শুধু একটু রক্তপাত, এর চেয়ে অনেক বড় ত্যাগের জন্যে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। ···জঙ্গলের সঙ্গে আমাদের লড়াই···মানুষের কাছে এই অরণ্যকে হার মানতেই হবে। ···আজ যেখানে অন্ধকার আর ভয়ের রাজত্ব, সেইখানেই একদিন শান্তিময় গ্রাম গড়ে উঠবে···। জঙ্গল সাফ করে এখানে আমরা সোণার ফসল ফলাবো···। মুঠো মুঠো সোণার ফসল···মানুষ তাই খেয়ে মানুষ হয়ে বাঁচবে।···

পিয়ালী নদীর ধারে মায়ার সেই শেষশয্যা। সেখানে শিবনাথের যাওয়া চাই রোজ রাতে। আকাশে জ্বলজ্বলে তারার মাঝে···চাঁদের মুখ দেখা পিয়ালী নদীর জলের হাজার টুকরোয় মায়ার চোখের সেই অতীত আলো শিবনাথের সঙ্গে কথা কয়।

পেছনকার জঙ্গলটা সাফ হয়ে গেছে। আকাশের মতই ধূ-ধূ মাটি! দানবটা মরে গেছে তাই বন্দিনী রাজকন্যা আজ মুক্ত··· পিয়ালী নদীটাকে অনেকখানি দেখা যাচ্ছে আজ একসঙ্গে···মনে হচ্ছে এ যেন তার মুক্তির বিস্তার।

অন্যদিন মায়ার কণ্ঠস্বর অরণ্যে প্রতিহত হয়ে পথ খুঁজে মরতো আজ তারা ছাড়া পেয়েছে উধাও মাঠের পানে।···গভীর অরণ্যের চেয়ে বিস্তৃত মাঠের হলুদ তৃষ্ণা দেখেই ভয় হচ্ছে শিবনাথের বেশী!··· এর পর একদিন ফসলের সবুজ ঝালরে ভরে উঠবে ঐ মাঠ···। আকাশ

থেকে বৃষ্টির জল নামবে তৃণে তৃণে ভালবাসা জানিয়ে। সে ত আকাশের জল নয়, সে মায়ার লক্ষ তারার চোখের জল। সে জল কান্নার নয়, আশীর্বাদের।

সবুজ ফসলের ক্ষেত দিয়ে হাওয়া বইবে শির-শির করে। ভাবতে ভাবতে শিবনাথের গায়ে শির-শির করে রোমাঞ্চ লাগে, কাঁটা দিয়ে ওঠে···। ···তারপর মানুষ আসবে এখানে, বাসা বাঁধবে, মুঠো মুঠো করে পেট পূরে খাবে সেই ফসল···।

ভাবতে ভাবতে রাত বাড়ে কত খেয়াল থাকে না শিবনাথের। সাধন এসে তাড়া দেয়, চল দা'ঠাকুর আর কতক্ষণ হিম লাগাবে শরীরে। খাওয়া-দাওয়া করে শোবে চল!

দুঃখের দিনে যে সাধন মাথা-পেতে সমস্ত ভার গ্রহণ করতে চেয়েছিল, সেই সাধন দুঃখনিশি প্রভাতের দিনেও সমানভাবে কাছে এসে দাঁড়ায়···!

মনোহর বলে, এমনি করে ঘরে ঘরে সাধনের দল গড়ে তুলতে পারবেন শিবনাথবাবু? পায়রার ঝাঁকের মত ঝাঁক ঝাঁক একই দলের মানুষ?

কালঝুরির চেহারার সঙ্গে সঙ্গে নামটাও তার পালটে গেছে।

এখনকার নাম তার মায়াঘাট। পিয়ালী নদীর যে ঘাটে এসে মায়ার শেষ তর্পন করেছেন শিবনাথ। যে ঘাটে মায়ার শুভ কল্পনার উদ্দেশ্যে পুঞ্জ পুঞ্জ সম্ভাবনার ঐশ্বর্য অঞ্জলি ভরে দিয়েছেন। এ সেই মায়াঘাট!

তুমি এর আগে যদি কালাঝুরি জঙ্গলকে দেখে থাকো ত' আজকের এই মায়াঘাটকে তুমি চিনতে পর্যন্ত পারবে না। মায়া বলে ভুল হবে। কিন্তু একবার যদি দেখো ভুলতে পারবে না মায়াকে,—এরই মধ্যে তাকে যেন চিনতে পারবে, যে এই সুন্দর ভবিষ্যতের জন্যে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে গেল নীরবে।

আগে দেখেছো কালো জঙ্গলটা যেন আকাশ টাকে শুদ্ধ গ্রাস করে বসে আছে আর এখন তার বদলে এতবড় একটা উপুড় করা আকাশকে

দেখে তোমার ভয়ই লেগে যাবে হয়ত! অতবড় বড় বড় গাছের বদলে দেখবে আদ্ধেক মানুষ প্রমাণ ক্ষেত—তাতে নতুন ফসল ধরেছে। এই নতুন দেশের নতুন ফসল দেখতে তোমার নতুন করে মিষ্টি লাগবে। তারপর যেখানে দেখেছিলে কয়েকঘর মুষ্টিমেয় জেলে পরিবারের বাস, সেখানে দেখবে কত নতুন নতুন মানুষেরা এসে বাসা বেঁধেছে। চাষী, তাঁতী, কুমোর, কামার…এমনি সব ধরণের মানুষ…!…দিনে রাতে তোমার দেশের মতই চন্দ্র সূর্য্যের আলো সমান ভালবাসায় গড়িয়ে পড়েছে এই দেশে।

তা যদি লক্ষ্য করতে পারো দেখবে এই নতুন দেশের লোকেরা তোমার কত আপন!

এদের সঙ্গে নিতান্ত আপনার জন হয়ে কুটির বেঁধে রয়েছেন শিবনাথ। সঙ্গে রয়েছে, সাধন, সোমনাথ, আর মনোহর মাষ্টার! শুধু শুধু বসে নেই শিবনাথ। তাঁর পরিকল্পনা চলছেই আরও সমৃদ্ধির পারঘাটার দিকে! মনে আছে শিবনাথের মায়া শান্তি খুঁজেছিল এর মধ্যেই। তাই মায়ার ধ্যানের ফসল এই মায়াঘাট,—ফসল ক্ষেতে ছিটিয়ে পড়া শিশির বিন্দুতে প্রভাতের রাঙ্গা রোদ ঝলমল করছে।…

রাতের বেলায় মনোহরের সঙ্গে শিবনাথের পরামর্শ চলে, আলোচনা চলে। সঙ্গে থাকে সাধন। সে তার সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে সেই যুক্তি পরামর্শের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে যার মাত্রার ওপর এই পরিকল্পনা সার্থকতা নির্ভর করছে।…

শিবনাথ বহু বিপদের অভিজ্ঞ মানুষ। কিন্তু মনোহর রঙীন স্বপ্নে এগিয়ে যায় অনেক বেশী অথচ কাজের জগতে খেই হারিয়ে ফেলে অনেকসময়। শিবনাথ তাকে বোঝান!…

সেদিন রাতে ওদের মধ্যে কথা হচ্ছিল!

মনোহর বলে, কিন্তু এসব তাঁতী কুমার কামার কামারী এদের আনবার এত গরজই বা কিসের?

শিবনাথ বলেন গরজ অনেক মনোহর, কেবল তোমাকে আর আমাকে নিয়েই ত' আর গ্রাম হয় না। মানুষের নিত্যকার প্রয়োজন

যারা মেটায় তারাই ত' আসল মানুষ গ্রামের। শুধু তাদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের ধারাটা বদলে নিতে চাই—এই আমাদের উদ্দেশ্য। তা নাহলে তারা যেমন থাকে সব থাকবে বই কি!

—মুস্কিল হচ্ছে যে, লোভ না দেখালে তারা আসবে কেন?

—কিন্তু লোভ দেখিয়ে যাদের আনবে তারা ত' একা আসবে না মনোহর। তাদের সঙ্গে লোভটাও আসবে যে···এসে মায়াঘাটে বাসা বাঁধবে!

—তা বটে! মনোহর নিজের মনে খানিকক্ষণ কি যেন ভাবে। তারপর প্রশ্ন তোলে, আচ্ছা শিবনাথ বাবু, আপনি সেদিন যে খাল কাটাবার কথাটা বলছিলেন—সেটা একটু বুঝিয়ে দেবেন কি?

—'নিশ্চয়ই দোব। শিবনাথের মুখে উৎসাহের আলো জ্বলে ওঠে। কাগজ পেনসিল নিয়ে ছবি এঁকে জিনিষটা ভাল করে বোঝাতে চেষ্টা করেন মনোহরকে।···এই দেখ, আমাদের পিয়ালী নদীটা এইখানে কতবড় একটা বাঁক নিয়েছে। এই সমস্ত বাঁকটার একেবারে শেষে হচ্ছে দেবী গঞ্জ—আর এই একেবারে এই মোড়ে হচ্ছে আমাদের মায়াঘাট। দেখ এর ধারে ধারে জঙ্গল এখনও রয়ে গেছে···আর পথ ঘাটও নেই·· তার মানে এই নদীই হল দুটোর মধ্যে যাতায়াতের একমাত্র পথ—

—পথ মানে? একেবারে রীতিমত একটি দিনের ধাক্কা নৌকো করে যেতে···।

—তাহলে আমরা যদি এমন একটা ব্যবস্থা করতে পারি যাতে এই বাঁকটা ঘুরে না গিয়ে সোজাসুজি একেবারে গিয়ে ওঠা যায় দেবীগঞ্জে!

—আপনি বলছেন এই বাঁকের দুটো মুখ সোজাসুজি জুড়ে দিতে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ—মানচিত্রটা দেখিয়ে বলেন শিবনাথ—বুঝেছো মনোহর বেশী নয় মাইল দুয়েক একটা খাল কাটতে পারলেই এই একদিনের রাস্তা এক বেলায় অনায়াসে চলে আসা যাবে। মায়াঘাট বাইরের জগতের সঙ্গে যুক্ত হবে।

আর বেশী কাটতেও হবে না আমাদের, ইতিমধ্যেই আমি ভাল করে

খোঁজ নিয়ে দেখেছি যে ওখানে এদিক ওদিক ছোট-ছোট জলা বিল আছে···সেগুলো জুড়ে দিতে পারলে—বলতে বলতে শিবনাথ কাগজের ওপর লাল পেনসিল দিয়ে বড় বড় করে ছক কেটে ফেলেন সেই কাল্পনিক খালের!

—কিন্তু সে যে অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হবে অনেক অর্থের প্রয়োজন সেটাও ত' ভাবতে হবে।

—আমি তা ভেবেছি। নিজেদের শক্তি সম্বল যা আছে তার ওপর নির্ভর করেই আমরা কাজে নামবো···দরকার হলে কিছু টাকা কর্জও করতে হবে—

কর্জ! মনোহর বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তাকায় শিবনাথের দিকে!

—হ্যাঁ কর্জ! এই খালের আয় থেকেই একদিন তা শোধ হয়ে যাবে এ বিশ্বাস আমার আছে। না মনোহর, আর কোন দ্বিধা নয়—এ খাল আমাদের কাটতেই হবে। মায়াঘাটের বড় হওয়ার রাস্তা আমরা খুলে দিচ্ছি এই আশা আর বিশ্বাস নিয়েই যেন আমাদের প্রত্যেকটি কোদালের ঘা পড়ে।

—কিন্তু এইখানেই যে আমার আপত্তি শিবনাথবাবু। নিরালায় বসে আমরা এই মায়াঘাটকে যেমনভাবে গড়ে তুলতে চাই বাইরের সংস্পর্শে তা কি আর সম্ভব হবে?

—বাইরের জগতকে অস্বীকার করে শুধু আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন দেখে ত' কোন লাভ নেই মনোহর—

—কিন্তু দেবীগঞ্জে ত' সেই সঙ্কীর্ণ স্বার্থ লোভ আর চক্রান্ত! তার সঙ্গে যোগাযোগ হলে মায়াঘাটের লাভ কি?

—লাভ কিছুটা আছে বই কি মনোহর! অন্ধকার যদি থাকে তাহলে চোখ বুজে থাকলেই তা'ত মিথ্যে হয়ে যায় না। তাকে স্বীকার করে নিয়ে আলো জেলে তাকে দূর করতে হয়। তাছাড়া আমাদের নদীর মাছ, ক্ষেতের ফসল সারা বছর খেয়েও ফুরোয় না! দেবীগঞ্জের বাজারটা পেলে তবু তার একটা গতি হবে। আর তার থেকেই আমাদের কর্জের টাকাটা উঠে আসবে। না মনোহর, আমাদের এ খাল

কাটতেই হবে···। যেমন করে একদিন কুড়ুল চালাতে হয়েছিল বনে বনে তেমনি করে চলবে কোদাল···

কথায় কথায় রাত্তির দুপুর হয়ে আসে। সাধন বলে ওঠে, আচ্ছা মাষ্টের, তোমার ঘরে একটু যাও ত' বাপু! আড়াই পহর রাত হল এখনো দাদাঠাকুরের খাওয়া হয়নি সে খেয়াল আছে? একবার বকৃতে সুরু করলে আর জ্ঞান থাকে না।—

মনোহর লজ্জিত হয়ে পড়ে। তাড়াতাড়ি বলে, সত্যিই আমি ভুলে গেছলাম। আচ্ছা আমি এখন যাই।

—আহা-হা ব্যস্ত হচ্ছ কেন মনোহর! শিবনাথ মনোহরের লজ্জাটা কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করেন।···খাওয়া ত' তোমারও হয় নি এখনও। তুমি না হয় আজ এখানেই খেয়ে যাও না!

সাধন একটু কড়া স্বরে বলে, খাবার ত' একজনের, তাতে কার পেট ভরবে শুনি?

ওদের জবাব দেবার আগে দরজায় কে যেন ধাক্কা দেয়।

—আঃ এত রাতে আবার কে জ্বালাতন করতে এল রে বাপু!—সাধন গরগর করে।

শিবনাথ বলেন, আহা, তুমি একবার বাইরে গিয়ে দেখ না সাধন?

দরজা খুলতেই দেখা যায় ঘোষাল দাঁড়িয়ে।

ফাঁক-দাঁতে বিচিত্র এক হাসি হাসতে হাসতে ঘোষাল বলে, কাণে সব সীসে দিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন নাকি? দরজা এতক্ষণ ধরে ধাক্কা দিচ্ছি তা সাড়াই নেই কারুর!

শিবনাথ তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলেন, কিছু মনে করবেন না··· একটু কাজে ব্যস্ত ছিলাম···তাই···

—ব্যস্ত যে ছিলেন তা ত' বুঝতেই পারছি···এই যে মাষ্টার তুমি তো এখনো ঠিক আছো দেখছি···আমাদের এখনো ভুলেটুলে যাও নি নিশ্চয়···আর শিবনাথবাবু ত' আমাকে চিনতেই পারলেন না!

মনোহর বললে, তোমায় চিনতে ত' খুব বেশীক্ষণ লাগে না ঘোষাল। তা হঠাৎ আমাদের ওপরে এ অনুগ্রহটা কেন বল ত?

ঘোষাল তাড়াতাড়ি বসে পড়ে বলে, হচ্ছে হচ্ছে···শনৈঃ শনৈঃ সব জানতে পারবে। এখন দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটা একটু বন্দোবস্ত কর দেখি !···

শিবনাথ একটু যেন চিন্তিত হয়েই বলেন, আপনি হাত-মুখ ধুয়ে নিন, সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি···

ঘোষাল বলে, বাইরে আমার একজন পাইক আছে আবার··· তাকেও যেন ভুলবেন না···।

মনোহর ঘোষালের হাত ধরে একটু টান দিয়ে বললে, এস হে তোমার হাত-মুখ ধোওয়ার ব্যবস্থা করে দিই।

ঘোষাল মনোহরের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একজনের বেশী খাবারের আয়োজন, শিবনাথেরও খাওয়া হয় নি, মনোহরেরও না, অথচ শিবনাথ এককথায় তুজনের খাওয়ার কথায় নির্বিবাদে রাজী হয়ে গেলেন। শিবনাথ বুঝেছিলেন নিতান্ত ভালমানুষ হলেও সাধন এতে রাগ করবেই। তাই ওরা বেরিয়ে যেতে শিবনাথ নরম গলায় বললেন, এক কাজ কর সাধন—।

সাধন সত্যি সত্যিই রাগ করেছিল। তাই গম্ভীর হয়ে জবাব দিলে, আমি পারবো না।

শিবনাথ না হেসে পারলেন না। বললেন, পারবো না কি বলছো সাধন? মায়াঘাটে তোমাদের প্রথম অতিথি এসেছে···তার সম্মান রাখতে হবেনা ?

—ওঃ, কি আমাদের অতিথি! ও ত' জমিদারের চর! মোসাহেবী করে ত' খায়! তার আবার এত দাপট কিসের ?

—ও যাই হোক···আজ ও আমাদের অতিথি এর বেশী আর কিছু জানবার দরকার নেই।

—তা বলে এই তুপুর রাতে তোমার নিজের খাবার ওকে ধরে দিয়ে তুমি খাবে কি ? সারারাত উপোষী হয়ে থাকবে ?

ওদের কথার মধ্যে মনোহর আর ঘোষাল এসে ঢুকলো ঘরের মধ্যে। ঘোষাল বোধ হয় সাধনের শেষ কথাগুলোর আভায পেয়েছিল। বললে, সারারাত উপোসী হয়ে আবার থাকছে কে ?

—ও কিছু নয়···কিছু নয়···আপনি ভাববেন না ঘোষাল মশায়। শিবনাথ কথাটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন।

—কিন্তু আমার কেন কেমন একটু গোলমাল ঠেকছে···আপনাদের খাওয়া হয়েছে ত' ?

মনোহর এই সুযোগে ঘোষালের ওপর একটু টিপ্পনী কাটে, পরের ভাবনা এত ভাবা তোমার ধাতে সইবে না ঘোষাল! তুমি শুরু করে দাও দিকি!

ঘোষাল একটু যেন থতিয়ে যায়। আমতা-আমতা করে বলে, কিন্তু সত্যিই এতরাত্রে এসে আপনাদের ওপর যেন জুলুম করলাম মনে হচ্ছে···

পরের দিন সকালে বেরোবার আগে শিবনাথ সাধনকে ডেকে বলে গেলেন, আমি একটু বেরুচ্ছি সাধন। ঘোষাল মশায়ের দেখাশোনার ভার তোমাদের ওপর রইল দেখো যেন কোন ত্রুটি না হয়! তিনি উঠেছেন কি?

—ওঠে নি আবার! সাধন ঘোষালের ওপর গায়ের ঝাল মিটিয়ে বলে, কোন্ সকালে উঠে চুপিচুপি গাঁ দেখতে বেরিয়েছে···জমিদারের কাছে গিয়ে সাতখানা করে লাগাতে হবে ত'?

—তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই। বুঝেছ সাধন, আমাদের কাজ আমরা করে গেলেই হলো···

শিবনাথ স্নিগ্ধ হাসিতে সাধনকে জল করে দিয়ে বেরিয়ে যান ঘর থেকে।

ঘরের মধ্যে মনোহর এসে ঢোকে। ঢুকতে ঢুকতে ডাকে, সোমনাথ! সোমনাথ···! ···সোমনাথ এখনো ওঠে নি'!···

সাধন বলে, ও, আজ তোমার বুঝি সেই পাঠশালা আছে মাষ্টের! যতসব পাগল এসে জুটেছে···। বলতে বলতে হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায় সাধন ঘর থেকে।

মনোহরের মনে যখন পাঠশালার চিন্তা ওঠে তখন ওর মুখের ওপর এমন এক বিচিত্র ভাব ফুটে ওঠে যে অশিক্ষিত সাধনের মনের

হাওয়াটাও যায় বদলে। মনোহরকে শুধু যে শ্রদ্ধা করবে না ভালবাসবে বুঝে উঠতে পারে না।

সোমনাথ ঘুমিয়ে আছে ঘরের একপাশে তক্তাপোষের ওপর! মনোহর সোমনাথের দিকে এগিয়ে যায়। ধীরে ধীরে ডাকে, সোমনাথ! বাবা! ওঠ, ওঠ!

ইতিমধ্যে ঘোষাল এসে ঢোকে ঘরের মধ্যে। মনোহরকে একলা পেয়ে একটু ব্যঙ্গ করেই যেন বলে, এই যে মাষ্টার! তোমাদের মায়াঘাট ত' দেখে এলাম হে! রাতারাতি কাণ্ডটা ত' করে ফেলেছো মন্দ নয়!

—তোমার ভাল লাগলো? মনোহর নীরস স্বরে প্রশ্ন করে।

—তা একরকম মন্দই বা কি করে বলি?…বেশ সাজানো গুছনো …ঝকঝকে তকতকেই ত' দেখলাম…। কিন্তু মাষ্টার, তোমাদের ব্যাপার কিছু বুঝে উঠতে পারলাম না। ছোট-বড় ইতর-ভদ্র-নিয়েই ত' গ্রাম! তোমাদের বাড়ীঘর দেখে তা ত' কিছুতেই বোঝবার জো নেই!

মনোহর জবাব দেয় না, শুধু চেয়ে চেয়ে হাসে।

ঘোষাল মনোহরকে চুপ থাকতে দেখে আবার প্রশ্ন তোলে, গাঁয়ের যে মালিক তার বাড়ীটাও ত' অন্ততঃ চিনে নেবার মত হওয়া দরকার!

মনোহর জবাব দেয়, এ গাঁয়ে যারা থাকে…সবাই যে এর মালিক ঘোষাল…সুতরাং আলাদা করে চিনবে কি করে?…

ঘোষালের মুখটা কুঁচকে যায়। একটু যেন বিরক্তই হয়। বলে, তোমার ও-সব বেয়াড়া কথা আমি বুঝি না মাষ্টার! উঁচু-নীচু না থাকলে কি গাঁয়ের শোভা হয়?

মনোহর আবার এক ফালি হাসি দিয়ে এড়িয়ে যায় ঘোষালকে। সোমনাথের দিকে ফিরে বলে, কই সোমনাথ, ওঠ! আজ পাঠশালে যেতে হবে মনে নেই?

ঘোষাল উপযাচক হয়ে জবাব দেয়, পাঠশালা তাহলে এখানেও খুলিয়েছো মাষ্টার? কিন্তু গাঁয়েত' পাঠশালার মতো কিছু দেখলামনা?…

—আমাদের পাঠশালা ত' গাঁয়ে নয় ঘোষাল, গাঁয়ের বাইরে।

মনোহরের গলার স্বর এত গম্ভীর যে ঘোষালের না জবাব দেবার কথা! কিন্তু তবু ঘোষাল জবাব দেয়, সে আবার কি? পাঠশালার বাড়ীঘর নেই?···

—না ঘোষাল! খোলা মাঠে গাছ তলাতেই আমাদের পাঠশালা!

—বল কি? উদোম মাঠে!···হেঁ-হেঁ মাষ্টার তুমি একেবারে ক্ষেপে গিয়েছো?···

মনোহর ক্ষেপে যাক্ আর না যাক্, ক্ষেপে গেল ঘোষালই! বাড়ী ফিরে জমিদার, নায়েব আর শিরোমণিকে উচ্ছ্বসিত ভাবে সে সব কথা জানায়।

নায়েব বলে, বল কি ঘোষাল?···এমন ব্যাপার?

—আমি স্বচক্ষে দেখে এলাম যে! একেবারে যেন ভোজবাজি! ঘোষালের চোখ দুটো বড় বড় গোল গোল হয়ে ওঠে!

শিরোমণির কিন্তু কথাটা ভাল লাগে না। সে এসে খবর দিতে পারলে না অথচ ঘোষাল এসে তাজ্জব বানিয়ে দিলে সবাইকে। শিরোমণি তাই যেন রুখে উঠলো একেবারে: হ্যাঃ ভোজবাজি! ঘোষালের আবার সব কথায় বাড়াবাড়ি!

ঘোষাল রেগে ওঠে এইবার। বলে, যাও না, নিজেরা গিয়ে দেখে এসো না! চোর-ডাকাত, বাঘ-ভালুকের ভয়ে যে জঙ্গলে দিন-দুপুরেও কেউ যেতো না, রাতারাতি সেখানকার চেহারা একেবারে পালটে দিয়েছে! মায়াঘাট ত' নয়, মায়াপুরীও বটে! ছবি! একখানা ছবি!···

জমিদারবাবু শুধু বল্লেন, হুঁঃ—

শিরোমণি একটু ভড়কে গিয়ে বলে, আর হবে না কেন?—হবে না কেন শুনি? ···আমাদের বাবুর অনুগ্রহ পেলে কি না হয়?···

এইবার অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন ষোড়শীকান্ত! আফশোসে এদিকে তাঁর বুকটা ভরে দম আটকে আসবার জোগাড়। একটা জঙ্গল কেটে অমন ভোগ করতে লাগলো লোকটা, অথচ একটু চাপ দিয়ে মোটা কিছু বাগিয়ে নিতে পারলেন না তিনি নিজে?···তাই ঘোষাল আর

শিরোমণিকে এক ধমকে থামিয়ে দেন তিনি, আঃ তোমরা থামবে? তারপর নায়েবমশাইর দিকে চেয়ে বললেন, দেখুন নায়েবমশাই, অমন জলের দরে তালুকটা ছেড়ে দেওয়া আপনার উচিৎ হয় নি!

—কিছু ভাববেন না আজ্ঞে···কিছু ভাববেন না···। নায়েব নিজের দূরদর্শীতাকে আরও প্রকট করে তুলতে চেষ্টা করে। ···কিছু ভাববেন না আপনি···ও সকালবেলাকার শিশির···রোদ লেগে একটু চিক্‌চিক্ করছে শুধু! একটু বেলা হলেই দেখবেন মিলিয়ে যাবে!···

—হুঁ। তা ঘোষাল, তোমাদের মনোহর মাষ্টার কি করছে দেখে এলে?

—আজ্ঞে তার কথা আর শুধোবেন না বাবু! একেই ত' তার মাথায় ছিট্, সেখানে গিয়ে একেবারে যেন ক্ষেপে গিয়েছে! উদোম মাঠের মধ্যেই নাকি পাঠশালা খুলবে!···ঘর নেই দোর নেই একেবারে মাঠের মধ্যে—

ঘোষালের কথায় হো হো করে হেসে উঠে সকলে।

সেই হাসিতে ঘরটা গম্‌গম্ করতে থাকে।

—পাঁচ—

আর এক হাসির কলরোল উঠলো এদিকে।

এ হাসি কাঁচা আর সরল প্রাণের হাসি। যে হাসি মাঠে মাঠে খেলে বেড়াচ্ছে, যে হাসি মাঠের সবুজের মতই অবারিত।

হাসছে নানান বয়সের মানুষ, ছেলে থেকে বুড়োর দল। এরা সব মনোহর মাষ্টারের পড়ুয়ারা। এরা সব মনোহরের পেছন পেছন এসে জড় হয়েছে বড় গাছটার নীচে। আর এসে জটলা পাকিয়ে কলরব করছে।

ভোরের কাঁচা রোদ আর কাঁচা শিশিরের চকমকি খেলা তখনও শেষ হয় নি। সেই জৌলুস চিক চিক করছে নতুন-ভবিষ্যতের আলোয়-ভরা ওদের চোখে।

মনোহর মাষ্টার উৎসাহের সঙ্গে চেঁচাচ্ছে, আয় আয়, নে বোস বোস—এইখানে সবাই বোস—।

সোমনাথ আজ নতুন এসেছে। সঙ্গে এসেছে সাধন।

সোমনাথ বলে, এইখানে বসবো? এ কি রকম ইস্কুল মাষ্টের মশাই? বেঞ্চি নেই, চেয়ার নেই, কিছু নেই···

—আরে বেঞ্চি চেয়ার থাকলেই কি ইস্কুল হলো? তা হলে ছুতোর মিস্ত্রীর বাড়ীই ত' ইস্কুল হতে পারতো! যেখানে আমরা পড়তে বসবো সেইটেই ত' ইস্কুল! নে বোস্, বোসে পড়!

সকলে গাছ তলায় গোল হয়ে বসে। ছোট বড় মাঝারী বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীর দল!

—কই তুমি বসলে না সাধন? মনোহর তাড়া লাগায় সাধনকে।

—আজ্ঞে এই কাচ্চা বাচ্চাদের সঙ্গে কি করে বসি বল ত' মাষ্টের! সাধন যেন একটু মুস্কিলে পড়ে যায়। হাজার হলেও সে যে বয়সে ওদের বাপ ঠাকুরদার সমান সেটা ভুলতে পারে না।

মনোহর বলে, যেমন করে আমি বসবো, তেমনি করে। শিখতে বসার বয়েস নেই, বুঝলে সাধন?…শিখতে বসার বয়েস নেই, বোস বোস…।…

সাধনও ওদের মধ্যে জায়গা করে নিয়ে বসে।

মনোহর গাছের গুঁড়িতে একটা বিরাট ভারতবর্ষের ম্যাপ ঝুলিয়ে দেয়।

সোমনাথ বলে ওঠে, ওটা কিসের ছবি মাষ্টার মশাই?…

—ওটা ছবি নয় রে, শুধু ছবি নয়। ঠাকুরের রূপ ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারি নে তাই নুড়ি সামনে রেখে তার পূজো করি। তেমনি যে দেশ আমাদের ধ্যান জ্ঞান, তারই ছাপা ছবি নিয়ে আমাদের কাজ সুরু, বুঝলি?…

ছেলেদের মধ্যে থেকে কে যেন বলে উঠে, কিন্তু বইটই ত' কিছু আনি নি! কি পড়বো মাষ্টারমশাই?

—এত কিছু সামনে পড়ে থাকতে কি পড়বি খুঁজে পাচ্ছিস নে! এই মাটি পড়বি, জল পড়বি, আকাশ-বাতাস এখানে যা দেখা যায় সব পড়বি!

এত বড় আশ্চর্য কথা, সাধন এতখানি বয়েস হল আজ পর্যন্ত শোনে নি। এই জল মাটি আকাশ বাতাস এ ত নিত্যকারের জিনিষ। বই পত্তর বাধ দিয়ে এর মধ্যে যে কি পড়বার আছে সাধনের সেটা মাথায় আসে না। সে বলে, পুঁথি পত্তর, বই কাগজ, শেলেট সে সব কিছু লাগবে না মাষ্টার মশাই?

—তাও লাগবে বই কি? তবে কি জানো, চারি ধারে চোখের সামনে যা মেলা রয়েছে তাই হল আসল পড়বার বই…আর পড়ুয়া হল মন! নকল পুঁথি পত্তরে এই সত্যিকারের পড়ার একটু ইসারা থাকে মাত্র!

—না মাষ্টার, তোমার এ পাঠশালা কোন কাজের নয়। তোমার না আছে বেঞ্চি পত্তর, বই কাগজও বলছো বিশেষ দরকার নেই···বেত গাছটা থাকলেও বুঝতুম পাঠশালা বটে!

এতকালের চোখে দেখা বিশ্বাসকে এককথায় সরিয়ে ফেলতে সাধ্যে কুলোয় না সাধনের!

সোমনাথ বেতের কথা শুনে আবদার তোলে, ও সাধন কাকা বেত্ত মারলে কিন্তু আমি পড়বো না···পাঠশাল থেকে পালিয়ে যাবো···হ্যাঁ···

মনোহর বলে, তোমার ভয় নেই গো, ভয় নেই। এ বড় মজার পাঠশালা। এখানে বেতও নেই···আর আমার এ পাঠশালা থেকে পালানোও যায় না···পালাবে কোথায় এ পাঠশালা তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাবে—

ছেলেদের দল হো হো করে হেসে ওঠে।

সে হাসিতে গম গম করতে থাকে মাঠ আর আকাশ।

মনোহর বলে, নে বল্ ভারতবর্ষ আমার দেশ!

সকলে প্রতিধ্বনি তোলে, ভারতবর্ষ আমার দেশ।

মনোহর বলে, মূর্খ দরিদ্র ভারতবাসীরা আমার ভাই আমার বোন। ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ···আমার আদর্শ।

সে কি অপূর্ব দীপ্তি মনোহরের মুখে!···

মনে হয় অরুণোদয় প্রভাতের আকাশে নয়, মনোহরের মনের দিগন্তে যেন লাল হয়ে উঠেছে।

বিশ্বাস হয় তোমাদের? বিশ্বাস কর অতবড় বট গাছের জন্ম হয় এতটুকু একটা বট ফলের বীজ থেকে?

অতবড় বনস্পতির পায়ের নীচে এক ফোঁটা করুণার মত যখন পড়ে থাকে বটফল তখন দেখে কোনদিন বিশ্বাস কর যে অত বড় বিস্তার অতখানি বৃদ্ধি ঘুমিয়ে আছে এতটুকু হয়ে ওর মধ্যে?

শুধু তাই নয়। এই বটফলকে আবার কোন নাম-না-জানা বনের পাখী নেহাৎ খুসিভরেই তুলে নিয়ে উড়ে গেল অন্য বনে। সেখানে ত্যাগ করলে তাকে।

সেইখানে জন্ম নিলে এক বট মাটির নরম কোলে।

কিংবা তোমাদেরই বাড়ীর এককোণে, দেয়ালের জোড় যেখানে দুর্বল হয়ে গেছে, সেই ফাঁকেই মাথা চাড়া দিয়ে বটের চারা গজিয়ে উঠলো। এতটুকু বীজ হলে কি হবে, তার থেকে যে শিকড় বেরুলো তোমার শক্ত-করে-গাঁথা ইটের দেয়ালের ফাটল দিয়ে রস হাতড়াতে হাতড়াতে বেড়ে চললো সেই চারা। তুমি অবাক হয়ে দেখলে, তার প্রাণশক্তির কাছে তোমার অত শক্ত দেয়াল হার মানছে, ফাট্ ধরছে।

অথচ সেই শক্তির মূলে কি আছে জানো ত! আছে এতটুকু এক বীজ—তাও কোন ছোট্ট পাখী এসে কোন্ অসতর্ক খেয়ালবশে ত্যাগ করে গেছে! আর সেই শক্তির শেষ কোথায় বলা যায় না এখন থেকে, শেষে একটা জঙ্গলই হয়ে যেতে পারে বটগাছের!

তাই বলছি বিশ্বাস কর, এতটুকু একটা বীজ থেকে জন্ম নেয় এতবড় এক বট!

যদি চোখে দেখতে চাও দেখে এসো মায়াঘাট!

মায়াঘাটের কি ছিল আগে? শুধু এতটুকু এক নিভৃত কল্পনা—স্বপ্নের মত খেলা করতো মায়ার মনে। তারপর বনের পাখীর মতই সে উড়ে এল সেই বীজ নিয়ে এই কালাঝুরির জঙ্গলে, তারপর সেই জঙ্গলে জল হাওয়ার আওতায় সেই বীজ জন্ম দিলে চারাকে!

তারপর দেখ মায়াঘাটকে। কি সু-বিরাট এক সৃষ্টি! নতুন মানুষ, নতুন পৃথিবী!

শিবনাথ মায়াঘাটের পথে যখন হাঁটে, দুধার দিয়ে প্রণাম পায়। ভালবাসা যেন ছড়িয়ে পড়ে চারিদিক থেকে, মালঞ্চের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে যেমন করে ঝরে পড়ে ফুল, গাছের ভীড় থেকে।

শিবনাথ ঘুরে ঘুরে খোঁজ নেয় পাড়ায় পাড়ায়। তাঁতী পাড়া, কুমোর পাড়া, জেলে পাড়া। প্রত্যেকেরই গ্রাম-জীবনে একটা বিশিষ্ট প্রয়োজন আছে। তাই শিবনাথের চোখে তাদের স্থান একই।

গ্রামে ডাক্তার আছে। রোগের ওষুধের ব্যবস্থা আছে। আর আছে মিউনিসিপালিটি, জনসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য রাখবার জন্যে।

পথে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা। শিবনাথ বলে, কি ডাক্তার খবর কি?

ডাক্তার বলে, আজ্ঞে খবর খারাপ।

—খারাপ! শিবনাথ একটু যেন ত্রস্ত হয়ে ওঠে।

ডাক্তার হাসে। বলে আজ্ঞে হ্যাঁ, মায়াঘাটে রোগও নেই রুগীও নেই। ডাক্তারের পক্ষে এর চেয়ে খারাপ খবর আর কি হতে পারে বলুন?...

শিবনাথও হাসে। তারপর বলে, দেখ ডাক্তার, শুধু রোগের জন্যেই তা ডাক্তার নয় ভাই। রোগ যাতে না হয় তার জন্যেই ডাক্তারের প্রয়োজন বেশী।

কথাটা খুব ঠিক। তার জন্যে ব্যবস্থাও আছে মিউনিসিপালিটির তরফ থেকে। তার জন্যে যুদ্ধ করতে হয় অশিক্ষার সঙ্গে, কুসংস্কারের সঙ্গে।...

এদিকে মনোহর মাষ্টার আছে। আছে তার পাঠশালা। সেখানে ছোট-বড় সবাইকে মানুষ করে তুলছে মনোহর। মাটির মানুষকে মাটির ওপর বসিয়ে পড়াচ্ছে, সত্যিকারের মাটির মানুষ বানিয়ে তুলছে।

জোঁকের মতই লেগে আছে শিবনাথ, লেগে আছে মনোহর! মায়াঘাটকে বেঁচে থাকার সব রকম রঙ দিয়ে রঙ্গীন করে তুলতে হবে।

ওদিকে খাল কাটা সুরু হয়ে গেছে।

কোদাল পড়ছে মাটিতে, চওড়া চওড়া ঝক-ঝকে শক্ত লোহার কোদাল! বলিষ্ঠ চিন্তার চওড়া বুকের মত ঝলসাচ্ছে কোদালগুলো রোদের আলোয়। হাজারো কোদাল চলেছে। পথ খোলা হচ্ছে মায়াঘাটের। পথ খোলা হচ্ছে নতুন এক সমৃদ্ধির। দেবীগঞ্জের সঙ্গে যুক্ত হতে পারলে কত সহজে আদান-প্রদান চলবে। কত লেন-দেন, কত মানুষ!

দেখতে দেখতে খাল কাটা শেষ হয়ে গেল। পিয়ালী নদীর জল এক হাত অপর হাতকে যেন জড়িয়ে ধরলে। বাঁধা হল মায়াঘাট আর দেবীগঞ্জ।

শিবনাথের পরিকল্পনা মতই অতি সহজে কাজ হয়ে গেল। যে

সমস্ত টুকরো টুকরো দীঘি, পুকুর মরে-হেজে পড়েছিল সেগুলো অল্প অল্প জোড়া দিতেই মস্ত এক খাল হয়ে গেল। আর সেই খালে খেলা করতে লাগলো পিয়ালী নদীর দুষ্ট জল সাপের মত!

সে সাপ কোন্ বাজীকরের বাঁশীর যাদুতে বন্দী হল কে জানে!

চলাচলের পথ খোলা হতেই প্রথম নৌকায় এলেন কেদার সান্যাল দেবীগঞ্জ থেকে। সঙ্গে এল হারাধন এবং আরও অনেকে।

শিবনাথ, মনোহর, সাধন এবং আরও অনেকে ওদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে মায়াঘাটের পারে এসে জমা হয়।

দূর থেকে দেখা যায় নৌকাখানা।

কলম্বাস আসছে যেন নতুন জগতে।

মনোহর চীৎকার করে, আসছে ওরা আসছে…

সাধন বলে, তুমি যে থির হয়ে দাঁড়াতে পাচ্ছো না মাষ্টের! ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছো!

মনোহর কেন, মনোহরের গলা শুদ্ধ কাঁপছে উত্তেজনায়। সে বলে, তুমি বুঝতে পারছো না সাধন আজ কী দিন! ভগীরথের গঙ্গা আনার কথা শুনেছো? আজ আমরাই মায়াঘাটের ভগীরথ! গঙ্গা আনতে পারিনি বটে তবে এনেছি গঙ্গার মত আশীর্বাদ! দুনিয়ার সঙ্গে মেলামেশার রাস্তা আমরা খুলে দিলাম!

নৌকো এসে ঘাটে লাগে। নৌকোর ধাক্কা লাগা প্রথম ঢেউ আছড়ে পড়ে মায়াঘাটের মাটিতে। পিয়ালী নদীর এক ফালি হাসি যেন উপচে পড়লো মায়াঘাটের মাটির ওষ্ঠে!

কেদার সান্যাল বয়সে প্রবীণ, বেশ অভিজ্ঞ লোক। গোলগাল চেহারা। চলনে বলনে একটা গম্ভীরভাব আছে!

মাটিতে পা দিয়ে কেদার বলেন, মাথায় ঠেকাও হারাধন মাথায় ঠেকাও! এ মাটি ছুঁলেও পুণ্য হয়।

—আজ্ঞে যথার্থ! হারাধন তাড়াতাড়ি মাটি তুলে মাথায় দেয়।

মনোহর আর সাধন পরস্পরের দিকে চেয়ে হাসে।

কেদার সান্যাল ওদের মধ্যে এগিয়ে এসে বলেন, দেখুন, শিবনাথবাবু কই? শিবনাথবাবু?

মনোহর দেখিয়ে দেয়, আঁজ্ঞে ইনিই। আপনারই সামনে দাঁড়িয়ে।

গ্রামের মানুষ শিবনাথ গ্রামেরই ছেলে-বুড়োর সঙ্গে এক হয়ে মিশে দাঁড়িয়ে আছেন। তবু তাঁর চোখে-মুখে বৈশিষ্ট্যের ছাপ!

কেদার বলেন, ওঃ আপনি! আপনিই শিবনাথবাবু! অবিশ্যি বলে না দিলেও চিনতে পারতাম! এ দেবতুল্য চেহারা কি ভুল হয়? আপনার নাম শুনেই তো ছুটে এলাম। এ যুগে এত বড় কীর্তি আরকেউ করেছে?

—কি যে সব বলেন? শিবনাথ হাত জোড় করে বলেন।

—না না বলবো না কেন? বলবো না কেন? তা দেখুন আমি বোধ করি আপনার বয়োজ্যেষ্ঠ তবু আপনাকে প্রণাম জানাচ্ছি।

—আমিও সমস্ত মায়াঘাটের হয়ে আপনাদের সবাইকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। আজ থেকে মায়াঘাট আপনাদেরও—আসুন আপনারা—

দুদিন পরে শিবনাথের কথাটা যে সত্যি অর্থাৎ মায়াঘাট যে কেদার সান্যাল প্রমুখ নতুন আগন্তুকদেরও সে কথা প্রমাণ হয়ে গেল।

মায়াঘাট এখন আর ছোট গ্রামটি নয়। বহু নতুন বসতি, নতুন বাড়ী, নতুন পথ-ঘাট বেড়েছে। সুখ-সুবিধা ও পরিধির দিক থেকে দেখলে মায়াঘাট এখন সহরের কৌলিন্যে গিয়ে পৌছায়।

এরই মধ্যে কেদার সান্যাল দোকান পেতে বসেছেন। আগে নামে মাত্র সুরু হয়েছিল এখন দেখতে দেখতে মস্ত বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেবীগঞ্জ থেকে সব মালপত্রের আদান প্রদানের বড় কেন্দ্র এই কেদার সান্যালের দোকান। কেদার সান্যাল নিজেও খুব হিসেবী লোক, পাকা লোক। অল্প দিনের মধ্যেই বেশ গুছিয়ে বাগিয়ে নিয়েছেন।

বেড়ে উঠেছে মায়াঘাট মধু চক্রের মত তিল তিল করে।

মলয় বাতাস যখন হু-হু করে বয় তার মাঝে চুপি চুপি বিষের হাওয়া যদি ভীড়ের মাঝে পথ করে নিয়ে এসে ঢোকে ত' প্রথমটা টের পাওয়া যায় না। তারপর তার বিষের ক্রিয়া যখন চলতে থাকে তখন ক্ষতটা চোখে পড়ে!

নতুন খালের পথে নতুন মানুষ এল অনেক। তার সঙ্গে সঙ্গে এল এক সন্ন্যাসী। পরণে লাল গেরুয়া, গলায় রুদ্রাক্ষ, কপালে ত্রিপুণ্ড্রক, মাথায় জটা—। অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই কোথাও। ভৈরবী সন্ন্যাসী। এক উদ্দেশ্যে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে লাল বসনে। উদ্দেশ্য যে এক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে সে উদ্দেশ্য তত্ত্বলাভ নয়,—কিছু অর্থ উপার্জন। পরণে লাল বসন, সেটা ত্যাগের চিহ্ন নয়, স্বার্থের আগুন দেহকে ঘিরে!

ঘরের কোণে নর্দমা থাকে ঘরের ময়লা জল বের করে দেবার জন্যে। আবার সেই নর্দমা দিয়েই বাইরের ইঁদুর এসে ঢোকে, বাসা বাঁধে ঘরের অন্ধকার কোণটায় তারপর কাগজ কাটে, কাপড় কাটে, অনিষ্ট করে!

আর এই সন্ন্যাসীও এসে ঢুকলো মায়াঘাটের এলাকায়। আর গ্রামের অপর প্রান্তে একটা পচা বিলের ধারে আসন গেড়ে সর্বনাশের পথের দিকে একটা নিশ্চিত আমন্ত্রণ লিপির মত নিশানা উঁচিয়ে বসে রইলো।

ঘোষণা করলে, এ পচা বিল সাধারণ বিল নয়, মা গঙ্গারই আসল পথ। তারপর কালক্রমে গঙ্গার জল দিক বদলে অন্যদিকে বয়ে গেছে কিন্তু এইটেই হল আদিগঙ্গার অঙ্গ!

ফলে সন্ন্যাসীর চরণে দৈনিক ফল মূল আর দক্ষিণার গঙ্গা নামলো আর দলে দলে গ্রামবাসী ঐ মরা গঙ্গার চরণামৃত খেয়ে গঙ্গা প্রাপ্ত হতে লাগলো রোগে, কলেরায়!

বিশ্বাস হয় তোমাদের? বিশ্বাস কর তুমি, যে যখন তুমি প্রথম মদ ধরলে তখন বেশী খেতে না অতি সামান্য। খেয়ে আনন্দ পেতে, নতুন করে শক্তি পেতে। তাই অল্প অল্প খেতে তোমার ভালই লাগতো। তারপর তোমার নেশা হয়ে গেল। তখন মাত্রা বাড়লো কিন্তু সেই পরিমাণ নির্জীব হয়ে যেতে লাগলে তুমি। তোমার রোগ হল শরীর ক্ষয় হয়ে যেতে থাকলো আর তুমি জেনে শুনেও আরও—আরও বেশী করে মদ ঢালতে লাগলে তোমার তৃষ্ণায় জ্বালায়···। তারপর একদিন হয়ত মারা গেলে তার ফলে···।

বিশ্বাস না হয় ত মায়াঘাটে এসো। দেখ দলে দলে গ্রামবাসী

আসছে সন্ন্যাসীর পায়ে। যার যা সাধ্য ঢেলে দিচ্ছে এক ফোঁটা পুণ্যি সঞ্চয়ের মূল্য হিসেবে। পচা গঙ্গার চরণামৃত খাচ্ছে, রোগ হচ্ছে, সারাতে আবার ছুটে আসছে ঐ সন্ন্যাসীরই পায়ে, আরও কিছু ঢালছে তার পায়ে, সন্ন্যাসীও আরও একটু বেশী করে ঢালছে পচা গঙ্গার জল ওদের মুখে, আর ওরা তার বিষ গিয়ে ঢালছে আশেপাশে, আর দলে দলে উজাড় হয়ে যাচ্ছে।

মদ নয় কি? অন্ধ সংস্কারের মদ তুমি বলবে না একে?

মিউনিসিপাল বোর্ডের অতিরিক্ত জরুরী সভা বসেছে। সেখানে উপস্থিত আছে, শিবনাথ, মনোহর, ডাক্তার, কেদার সান্যাল এবং আরও কয়েকজন। পচা ডোবার জল খেয়ে গ্রামে যে মহামারী দেখা দিয়েছে তার একটা সময়োচিত বিধি-ব্যবস্থা করবার জন্যেই এই সভার আয়োজন!

ডাক্তার বলছিল, দেখুন আপনারা আজ গ্রামের অবস্থা। যা ভয় করা গিয়েছিল ঠিক তাইই ঘটেছে। মহামারী সুরু হয়ে গেছে··· মড়ক! ঐ পচা ডোবার জল ভক্তিভরে যারা খাচ্ছে কলেরা আর টাইফয়েডে তারা দিব্যি তরে যাচ্ছে···। এখনই যদি ওর একটা ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে অবস্থাটা যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ঠিক নেই···। সেই জন্য আমি জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার দিক থেকে বিবেচনা করে আপনাদের অনুরোধ করছি যাতে এর একটা তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা হয়!

ওপাশ থেকে গম্ভীর মুখে কেদার সান্যাল প্রশ্ন তোলেন, এরই মধ্যে এতখানি গড়িয়েছে!

কি বলছেন আপনি? উত্তেজিত হয়ে ওঠে ডাক্তার! দক্ষিণ পাড়ার ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠেছে। সোণাডাঙ্গায় কালকের মধ্যেই অন্ততঃ তিরিশ জন লোক মোক্ষলাভ করেছে···।

মনোহর ভয় বিস্ময় মিশ্রিত স্বরে বলে, বল কি ডাক্তার?

—হ্যাঁ হ্যাঁ তবে আর বলছি কেন যে ঐ লুপ্ত গঙ্গার এখনি একটা ব্যবস্থা না করলে এ গাঁয়ে বাতি জ্বালতে আর কেউ থাকবে না। আগুনের মত দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ছে রোগ···।

শিবনাথ উঠে দাঁড়ান এইবার। বলেন, আপনারা সব ডাক্তার-বাবুর কাছে মহামারী প্রচণ্ড প্রকোপের কথা শুনলেন আর তাছাড়া আপনারা নিজেরাও ব্যক্তিগতভাবে অনেক কিছু দেখছেন সুতরাং আমি প্রস্তাব করছি যে, অবিলম্বে ঐ পচা ডোবা বুঁজিয়ে ফেলার ব্যবস্থা হোক—আপনারা কি বলেন ?

—নিশ্চয় নিশ্চয়। অন্যান্য সকলে সায় দেয় ৷

কিন্তু কেদার সান্যাল উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, কিন্তু শিবনাথবাবু, এটা হল পাড়া গাঁ ; এখানে মানুষের সংস্কারের ওপর, ধর্মবুদ্ধির ওপর আঘাত করলে ফলটা অন্যরকম দাঁড়াতে পারে—তাই আমার মতে অন্য কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারলে—

—কিন্তু যেখানে সমস্ত মানুষের জীবন মরণের সমস্যা দেখা দিয়েছে সেখানে তুচ্ছ সংস্কারের ভয়ে আমাদের পিছিয়ে থাকলে ত চলবে না। আমাদের একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেদের বিবেচনাতে শুভবুদ্ধিতে যা বলে তাইই করতে হবে। ভয় পেলে ত চলবে না। কি বল ডাক্তার !

—নিশ্চয়ই। এখুনি আমাদের ডোবা বোজাবার ব্যবস্থা করতে হবে······তা না হলে এমনি মুখের কথায় ওদের থামানো যাবে না······ আর তাছাড়া তাতে যা সময় লাগবে তার মধ্যে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবার সম্ভাবনা ···

—নিশ্চয় নিশ্চয়। জনতার পক্ষ থেকে সমর্থন শোনা যায় !

লুপ্ত গঙ্গার ধারে মানুষের মেলা বসেছে। এক পাড়ে বিরাট এক বটগাছের নীচে ধুনি জ্বেলে বসে আছে সন্ন্যাসী। আশেপাশে অশিক্ষিত নির্বোধ মানুষের দল ভিড় জমিয়েছে। ওদিকে একটা ছোটখাটো কীর্তনের আসরও জমে উঠেছে পয়সার মোহে। মাঝে মাঝে সন্ন্যাসী কমণ্ডলু থেকে গঙ্গাবারি ঢেলে দিচ্ছেন প্রার্থীদের হাতে, তারা গণ্ডুষ ভরে পরম ভক্তির সঙ্গে পান করছে।

তাঁতিপাড়ার কেনারাম আদক একটুখানি অমৃত ধারণ করবার জন্যে সবে মাত্র হাতদুটো জোড় করে পেতেছে এমন সময়ে পেছন থেকে ডাক শুনে চমকে দাঁড়ালো।

মুখ ফেরাতেই চোখে পড়লো ডাক্তার দাঁড়িয়ে। তার সঙ্গে শিবনাথ, মনোহর আর একদল কিষাণের দল, হাতে তাদের কোদাল, আর মাটি বইবার ঝুড়ি।

—কি মুখে দিচ্ছ কেনারাম? ডাক্তার কঠিন স্বরে প্রশ্ন করে।

—আঁজ্ঞে যা মুখে দিলে সাতপুরুষ তরে যায় সেই পবিত্র গঙ্গাজল!

—ফেলে দাও কেনা! এই পচা ডোবার জল মুখে দিয়ে গাঁয়ের সর্বনাশ ডেকে আনতে চাও?

—আঁজ্ঞে ডাক্তারবাবু এ ত পচা ডোবা নয়—এযে লুপ্ত গঙ্গা…… জানেন না?

—লুপ্ত গঙ্গা! মা গঙ্গার খেয়ে দেয়ে কাজ নেই তিনি এই পচা ডোবায় এসে লুকিয়ে বসে আছেন। খবরদার বলছি, এ সব বুজরুকিতে বিশ্বাস করো না। …

—আজ্ঞে কি বলছেন বাবু……আপনার পাপ লাগবে …

—পাপ লাগবে! ওঃ। জেনে রেখো কেনারাম—পাপ যদি কারও লাগে ত' লাগবে ঐ জোচ্চোরটার, ঐ সন্ন্যাসীর যাকে এতগুলো লোকের প্রাণের জন্যে জবাবদিহি দিতে হবে একদিন—

গোলমাল শুনে এগিয়ে আসে সন্ন্যাসী জায়গা ছেড়ে। খুব নরম স্বরে বলে, আপনি ডাক্তার বুঝি?

—হুঁ। নিতান্ত সংক্ষেপে জবাব দেয় ডাক্তার!

—অনেক বিলিতি কেতাব পড়েছেন—কিন্তু আপনাদের কেতাবে লেখা নেই বলে মনে করছেন মা গঙ্গার মহিমা সব মিথ্যে?… এ অপমানে মা গঙ্গা যদি রুষ্ট হন তবে আপনাদের ম্লেচ্ছ বুদ্ধি দিয়ে সামলাতে পারবেন?

বোঝা গেল সন্ন্যাসী রীতিমত ঝগড়া করবার জন্যেই প্রস্তুত হয়ে এসেছে—। ডাক্তার বললে, এই পচা ডোবার জলকে পচা বললে যদি দোষ হয়, আর না খেলে যদি মা-গঙ্গা কুপিত হন, তবে তা সামলাতে হবে বই কি? আর সামলাতেই যদি হয় তাহলে আমার শিক্ষিত

বিদ্যাবুদ্ধি যাকে আপনি ম্লেচ্ছ বলে উপহাস করলেন, আমার সেই বিদ্যাবুদ্ধি দিয়েই তাকে ঠেকাতে হবে, বুঝলেন ?

সন্ন্যাসী কি বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তাকে বলবার সুযোগ না দিয়ে শিবনাথ এগিয়ে এসে বলেন, দেখুন আমাদের বাজে কথায় সময় নষ্ট করার অবসর নেই। আমাদের এখুনি কাজ আরম্ভ করতে হবে···। তারপর ঐ কিষাণদের দিকে ফিরে বলে, ওরে তোরা কাজ আরম্ভ কর দেরী করিস নে···নে নে লেগে পড় লেগে পড়···।

চরম অপমান! সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মুখ দারুণ রাগে গায়ের কাপড়খানার মতই লাল হয়ে টক্‌টক্ করতে লাগলো। অগণিত গ্রামবাসির দল যারা এতক্ষণে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে ডাক্তারের দুঃসাহসিক কথাবার্তা শুনছিল তাদের নিজের দলের দিকে শেষবারের মত টেনে নেবার জন্যে সন্ন্যাসী ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করলে। চুল ফাঁপিয়ে, চোখ-ঘুরিয়ে পাকা অভিনেতার মত বলতে সুরু করলে।

এতবড় কথা! দেখি কার···কার এতবড় ক্ষমতা···দেখি মা গঙ্গার মুখে মাটি চাপা দেয় এমন কোন্ পাষণ্ড এ গ্রামে আছে···কই কই কে আছে বিধর্মী নাস্তিক···কোদাল নিয়ে এগিয়ে আসুক দেখি···কই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে যে বড়···চালাও কোদাল দেখি কত বড় সাহস···

অদ্ভুত মুহূর্ত। একদিকে নতুন জীবনের অমোঘ আশীর্বাদ আর একদিকে যুগযুগান্তের সংস্কার ঘুমন্ত সর্পের মত মাঝে মাঝে কিল্‌বিল করে উঠছে।

এইবার এগিয়ে আসেন শিবনাথ। কোনো আড়ম্বর নেই, কোন বাড়াবাড়ি নেই, ধীরকণ্ঠে বলেন, চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকো না তোমরা ···কাজ আরম্ভ কর—

অসাড় শীতের দিনের দেহে রৌদ্রের আলো পড়ছে যেন!

স্তম্ভিত হয়ে সন্ন্যাসী দেখলে একের পর এক কোদাল পেশী বহুল বলিষ্ঠ হাতে উদ্যত হয়ে উঠেছে।

শেষ বারের মত ফেটে পড়লো সন্ন্যাসী, থামাও এখনও সময় আছে··· হাত খসে পড়বে বলে দিচ্ছি, হাত খসে পড়বে—

এবার শিবনাথ নিজে এগিয়ে এলেন। হাতে করে তুলে নিলেন এক-খানা কোদাল নিজে। তাঁর হাতেই এ কাজের প্রথম উদ্বোধন হবে। সন্ন্যাসী চীৎকার করে চলেছে তখনও, এখনও বলছি শিবনাথ, পৃথিবীতে ঘোর কলি তবু দেবতারা এখনো জাগ্রত। ওই কলুষিত হাতে যদি মা গঙ্গার অঙ্গ স্পর্শ কর তাহলে দেবতার কোপে মায়াঘাটের একটি প্রাণীও রক্ষা পাবে না···শিবনাথ···শিবনাথ···সমস্ত ছারখার হয়ে যাবে···আমি অভিশাপ দিচ্ছি···মহামারী···ধ্বংস অনিবার্য···সর্বনাশ হবে তোমাদের—

এতগুলো চীৎকারের মাঝে একটা মাত্র শব্দ খুব স্পষ্ট হয়ে উঠলো—শিবনাথের কোদালের প্রথম আলিঙ্গন মাটির সঙ্গে।

তার পর মনোহরের!

আগুনের মত জ্বলছে সন্ন্যাসী 'ভৈরবাচার্য।

আগুন জ্বলছে শিবনাথেরও মনে। আশার আগুনে লালে লাল হয়ে গেল মনের আকাশখানা!

ওদিকে সত্যি সত্যিই লাল হয়ে উঠলো দক্ষিণ কোণের আকাশ!

আগুন! হ্যাঁ হ্যাঁ আগুন লেগেছে দক্ষিণ পাড়ার গ্রামে।

সাপের মত খেলে বেড়াচ্ছে আগুনের শিখা ঘরে ঘরে!

পাগল হয়ে ছুটলো শিবনাথের দল!

আর দানবের মত হা-হা করে হাসতে লাগলো সন্ন্যাসী ভৈরবাচার্য।

কেন এমন হয়? যে শুভ সম্ভাবনার জন্যে লড়াই করে তাকে অশুভ এসে গ্রাস করে, ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে চায়!

কেন এমন হয়? কেন এমন হল? সত্যি সত্যিই দক্ষিণপাড়া গ্রামটা আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। শত চেষ্টা করেও শিবনাথের দল সেই আগুনের ক্ষুধাকে নেভাতে পারলে না। সমস্ত গ্রামটা উজাড় হয়ে গেল। শকুন-শেয়ালের দল পরম উৎসবে ভোজ লাগিয়ে দিলে। আর সরার মাঝে সন্ন্যাসীর সেই বিকট হাসির প্রতিধ্বনি খেলা করে বেড়াতে লাগলো দিকে দিকে!

শুধু তাই নয়, দুরন্ত টাইফয়েড ধরেছে সোমনাথকে। অবস্থা খারাপ, যমে-মানুষে টানাটানি চলছে।

মনোহর, শিবনাথ আর সাধন সোমনাথকে ঘিরে বসে আছে ঘরের মধ্যে। মনোহরের চোখে মুখে আর সে দীপ্তি নেই। সাধন যেন বেশী করে বোকা হয়ে গেছে। শিবনাথ যেন একটা নিস্পন্দ পাথর!

মনোহর বলছিল, আর কি, একটা স্মৃতিস্তম্ভ খাড়া করে এবার বিদায় নিলেই ত' হয়। পথে যেতে যেতে যদি কখনো কারো সেটা চোখে পড়ে, সে হয়ত' জানবে কোনো একদিন মায়াঘাট নামে একটা বিফল স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম।

এত দুঃখেও শিবনাথ কথা কন। বলেন, স্বপ্ন বিফল হয় মনোহর, চেষ্টা বিফল হয় না। আধমরা মায়াঘাটকে আবার বাঁচিয়ে তুলতে হবে নতুন করে। আগে সোমনাথ বাঁচুক···সেই সঙ্গে সঙ্গে মায়াঘাটকে আবার বাঁচিয়ে তুলতে হবে···।

—কাদের বাঁচিয়ে তুলবেন? যা ছিল, তার আদ্ধেক মড়কে কাবার হয়ে গেছে, বাকী আদ্ধেক তল্পিতল্পা বেঁধে পাগলের মত পালাচ্ছে।

এতক্ষণ সাধন চুপ করে ছিল। এতক্ষণে বলে, ওরা বলছে কি জানো দাঠাকুর? বলছে গাঁয়ে সত্যিই মা গঙ্গার কোপ লেগেছে। এখানে থাকলে পিঁপড়েটিও বাঁচবে না। একটা উপায় কর দাঠাকুর, একটা উপায় কর! একটু পূজো আচ্চা করলে দেবতা যদি তুষ্ট হয় তবে কি দরকার বাপু এত ফ্যাসাদে? কি বল মাষ্টের?

—হ্যাঁ, আমিও তাই বলছি সাধন! কিছুতেই যখন কিছু হল না, তখন ভৈরবাচার্যকেই বলে কয়ে ঐ পঙ্ককুণ্ডটাই না হয় সাফ্ করে ফেলা যাক্! অন্ততঃ জলের বিষটা ত' যাবে?

—তা হয় না মনোহর! একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে নিয়ে বলে শিবনাথ। মনের বিষ থাকতে শুধু জলের বিষ তাড়িয়ে মায়াঘাটকে বাঁচানো যাবে না। সমস্ত মন দিয়ে যাকে মিথ্যা বলে জানি তার সঙ্গে ভয়ে ভয়ে রফা করে মায়াঘাটের পরমায়ু ভিক্ষে করতে আমরা পারবো না—!

—কিন্তু অমনিতেই মায়াঘাটের পরমায়ু যে শেষ হয়ে এসেছে।

এমনি সময়ে ডাক্তার এসে ঢোকে ঘরের মধ্যে। মুখ চোখ তার অদ্ভুত রকমের উদাস, ভাবহীন।

ডাক্তার বলে, হ্যাঁ আর তার সঙ্গে আমারও মেয়াদ ফুরিয়েছে। আজ সব বাড়ী থেকে কুকুরতাড়া করে আমায় বের করে দিয়েছে, জানেন আপনারা? আমার ওষুধ কেউ ছোঁবেনা! ভৈরবাচার্য সকলকে জানিয়ে দিয়েছে আমি নাকি মূর্তিমান অধর্ম। নাঃ, মনে হচ্ছে যা কিছু শিখেছি যা কিছু জানি সব ভুলে গিয়ে···ওই লুপ্ত গঙ্গার এক গণ্ডুষ জল নিজেই খেয়ে আসি!

—আঃ কি বলছো ডাক্তার! আমাদের অমন মুষড়ে পড়লে চলবে না···লড়াই করে যেতেই হবে···। আমাদের বাঁচিয়ে তুলতে হবে আবার এই মায়াঘাটকে···।

—সেই আশাতেই ত' এখনো বেঁচে আছি শিবনাথ বাবু···তা না হলে এ ত পাগল হয়ে যাবার কথা···।···তা যাক্, সোমনাথ কেমন আছে বলুন···ওকে ত' আগে বাঁচাতে হবে···।

ডাক্তার সোমনাথের দিকে এগিয়ে যায়। ভাল করে পরীক্ষা করে সোমনাথকে। মুখ তার গম্ভীর হয়ে আসে।

—কি দেখছো ডাক্তার? শিবনাথ প্রশ্ন করেন।

—দেখবো আর কি শিবনাথ বাবু! আমার বিজ্ঞানের যতদূর দৌড় ছিল আমি প্রাণপণ চেষ্টা করে দেখেছি···কিন্তু এখন আমার ক্ষমতার বাইরে···এবার দয়া করে ছুটি দিন শিবনাথবাবু···নইলে হয়তো লজ্জায় পড়ে যাবো···।

—একটা কথা বলবো দাঠাকুর? সাধন প্রশ্ন করে।

—বল।

—তোমাদের ভালমন্দ সত্যি মিথ্যে আমি বুঝি না। কিন্তু খোকার প্রাণ তোমাদের সবকথার চেয়ে আমার কাছে বড়। খোকাকে আমার হাতে দাও···আমি যেমন করে পারি ভৈরবাচার্যের পায়ে ধরে ওর প্রাণ ভিক্ষে করে আনবো···

শিবনাথ নিরুত্তর।

—আর অমত করো না দাঠাকুর···অনেক ত যুঝে দেখলে, দেবতার সঙ্গে লড়াই করে কি কেউ পারে? কি মাষ্টের চুপ করে আছো কেন?

—আমার ত' আর বলবার কিছু নেই···তুমি যা বলছো তাতেই যদি খোকা ভাল হয়, তবে তাই হোক! সত্যিই দেবতার বিরুদ্ধে আর কত লড়াই করবো!

—শুনছো দা'ঠাকুর?

—না সাধন!

—না! এখনও না? তোমার ছেলের প্রাণটার চেয়ে তোমার জেদটাই বড়!

—সাধনের ভেতরকার আদিম মানুষটা উঁকি দিচ্ছে যেন!

—জেদ! শিবনাথ ঘোলা চোখে তাকান সাধনের দিকে।

—নিশ্চয়! ছেলেকে বাঁচাবার জন্যেও ঠাকুর দেবতাকে একবার মানতে পারো না? না তোমার কোন কথা শুনবো না···

—অমন অস্থির হয়ো না সাধন!

—অস্থির হবো না? আমি ত' পাথর নই···আমার মায়া আছে, মমতা আছে, খোকা যেতে বসেছে আর তুমি আমাকে স্থির থাকতে বলছো দাঠাকুর! আমি জোর করে খোকাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবো, ভৈরবাচায্যির কাছে ···দেখি তুমি কি করতে পার?···

—যেতে আমাকেও হবে সাধন!

—যাবে দাঠাকুর, যাবে?

—যাবেন আপনি? ডাক্তার আর মনোহরও উৎসুক হয়ে ওঠে। এ কি বলছে শিবনাথ!

—হ্যাঁ, যেতে আমায় হবে সেখানে সাধন। বুঝেছ মনোহর, বুঝেছ ডাক্তার, ভৈরবাচার্য সমস্ত গ্রামকে যেখানে টেনে নিয়ে গেছে সেখানে না গিয়ে আমার উপায় নেই···এখনো সময় আছে···এখনো সময় আছে ···এখনো শেষ চেষ্টা করে দেখলে যারা মরতে বসেছে তাদের থামাতে পারা যাবে···

অদ্ভুত রকমের করুণ দৃশ্য লুপ্ত গঙ্গার ধারে।

সন্ন্যাসী ভৈরবাচার্য হাত পা ছুঁড়ে পাগলের মত চেঁচাচ্ছে—পালা

পালা সময় থাকতে এখান থেকে পালা। মা গঙ্গার অভিশাপ লেগেছে। কেউ রক্ষা পাবে না···কেউ বাঁচবে না, শেয়াল-শকুন ছাড়া এ গাঁয়ে আর কিছু থাকবে না···যা যা সবাই পালিয়ে যা—

আর সত্যি সত্যিই আগুন-লাগা-বনে ভীত পশুর মত ত্রস্ত নিরীহ গ্রামবাসীর দল তল্পি তল্পা গোটাচ্ছে। পালাচ্ছে।

এদের মধ্যে এসে শিবনাথ যেন রুখে দাঁড়ালেন। শিবনাথের সঙ্গে এসেছে ডাক্তার!

—দাঁড়াও! চীৎকার করে বল্লেন শিবনাথ!

দ্রুত দুনে বাজাতে বাজাতে পট করে প্রধান তারটা যেন ছিঁড়ে গেল সেতারটার। এমনি একটা হঠাৎ যতি এসে পড়লো ওদের গতিস্রোতে।

—কোথায় যাবে এরা? সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন শিবনাথ সন্ন্যাসীকে। বুকের রক্ত দিয়ে যে গ্রাম এরা গড়ে তুলেছে সে-গ্রাম ত্যাগ করে কোথায় এরা আশ্রয় পাবে?

—যেখানে দেবতার অপমান হয়, সেখানে এরা কেউ থাকবে না!··· যা তোরা চলে যা···এ গাঁয়ে থাকলে দেবতার কোপে কারও রক্ষা নেই—। সন্ন্যাসীর ভৈরব নৃত্য তখনও চলেছে।

—যেও না তোমরা, দাঁড়াও।···শুনুন ভৈরবাচার্য আমি জানতে চাই আপনার দেবতার কি শুধু কোপই আছে? করুণা নেই?···আপনার দেবতাকে আপনি নিজেই চেনেন না ভৈরবাচার্য! সত্যকার দেবতা কখনো ভয় দেখিয়ে ভক্তি আদায় করেন না···তিনি চান মানুষের কল্যাণ···মড়ক মহামারী তাঁর বাহন নয়।

আজ এক নতুন আলো ফুটে উঠছে শিবনাথের মুখে।

কিন্তু ধূর্ত লোক এই ভৈরবাচার্য। কথার উত্তরে উচিৎ মত জবাব দেবার শিক্ষা তার আছে। সে বলে, মড়ক মহামারী দেখে এখন আঁতকে উঠলে চলবে কেন? মা গঙ্গাকে যখন অপমান করেছিলে, তখন মনে ছিল না?

—না গঙ্গা নয়···এ মড়ক মহামারীর জন্যে দায়ী আপনি! চীৎকার

করে বলে ওঠে ডাক্তার পেছন থেকে। রাগে আর উত্তেজনায় ডাক্তার ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে।

—আমি!

—হ্যাঁ, আপনি। শিবনাথ সমর্থন করেন ডাক্তারকে। গাঁয়ের লোকের অল্প বিশ্বাস আর ভক্তির সুযোগ নিয়ে এই পচা ডোবার জল আপনিই তাদের খাইয়েছেন! দেবতার দয়া অসীম···কিন্তু মানুষের মূর্খতা তিনি ক্ষমা করেন না। শুধু বুজরুকি আর ভণ্ডামিতে পচা ডোবা কখনো পবিত্র গঙ্গা হয়ে ওঠে না!

কোণ-ঠাসা হয়ে যাচ্ছে ভৈরবাচার্য। কিন্তু আত্মরক্ষা তাকে করতেই হবে। তাই অসম্ভব রকম চীৎকার করে বলে, পচা ডোবা···এখনো ওই পাপমুখে তুই দেবতার অপমান করছিস্! জানিস্ তার ফল কি? জানিস্ তার জন্যে তোর বংশ লোপ পাবে···তোর ছেলে তিন দিনের মধ্যে মরবে?

—বেশ। এই যদি আমার সত্যের পরীক্ষা হয় তা হলে আমিও বলছি—আমি যদি আমার ভগবানের কাছে কোন অপরাধ না করে থাকি তবে আমার সোমনাথ মরবে না···মরতে পারে না ভৈরবাচার্য।

স্তব্ধ হয়ে গেল সন্ন্যাসী!

বিকট শব্দে বাজ পড়বার পরের মুহূর্তটাকে এমনই থমথমে মনে হয় বটে।

শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেল সোমনাথ! শিবনাথই জয়ী হল শেষে!

কেন এমন হল? কেন এমন হয় বলতে পারো? ঘন দুর্যোগে বাহিনীর পর বাহিনী কালো মেঘ আসে, আসে জল-ঝড়-ঝঞ্ঝা-বিদ্যুৎ, তারপর খানিকক্ষণ লড়ায়ের পর আবার পেছনের সূর্যটা দেখা দেয়।

সূর্যটার তেজ এতই নাকি বড় যে, অতবড় ঝড়ের প্রলয়টাকে তুচ্ছ মনে হয় তার কাছে!

ক্রমান্বয়ে সাত দিন সাত রাত দুর্যোগের পরেও!

—ছয়—

চাকা ঘুরলো।

মায়া ঘাটের আগেকার শ্রী-সমৃদ্ধি সবটা না হলেও কিছু কিছু ফিরে এসেছে। কিছু-কিছুই বা কেন অনেকটাই ফিরে এসেছে সত্যি কথা বলতে। আবার বসতি বেড়েছে। লোক-জন, আদান-প্রদান।

তবে চেহারাটা অনেকটা সেই রকমের হয়ে এলেও অন্তরটা তার আগের থেকে অনেকটা বদলে গেছে। বদলে গেছে মায়াঘাটের মানুষগুলো। এখানকার মানুষগুলো এখন যে-কোন জায়গার মানুষ-গুলোর মধ্যে অবাধে গুলিয়ে যেতে পারে, আগে যা সহজে পারতো না।

সোমনাথ এখন যুবক। আর সেই ছোট খোকাটি নেই সে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নিজস্ব বুদ্ধি বিবেচনাকে সে সকল ক্ষেত্রে জাগ্রত করে তুলতে চাইছে। কত কালের পুরনো চৌধুরী বংশের রক্ত তাতাচ্ছে তার যৌবনকে…। খেলা করছে সেই রক্ত তার শিরায় শিরায়।

উদ্দাম যৌবনের মতই দেখায় সোমনাথকে যখন সে টমটম হাঁকিয়ে ঘুরে বেড়ায় মায়াঘাটের বহুধা-বিস্তৃত পথে-পথে! পিয়ালী নদীর ধারে!

প্রৌঢ়ত্বে এসে পৌঁছেছে শিবনাথ। বুড়ো হয়ে গেছে কেদার সান্যাল। কেদার সান্যাল প্রতিষ্ঠিত ছোট্ট দোকান বাড়তে বাড়তে এখন ঠেকেছে মায়াঘাট সাপ্লাই কর্পোরেশনে। বিরাট কারবার। সব রকম কাজকর্ম হয় সেখানে।

আর একটি জিনিষ বেড়ে চলেছে সেই সঙ্গে সঙ্গে তা হল লোভ!

চাকা ঘুরছে।

মায়াঘাটের নয়, মায়াঘাটের ষ্টীমার ঘাটে এসে ভিড়বে যে

ষ্টীমারখানা তার গোল গোল ঢেউ-লাগানো চাকা। ভোরের সময় একখানা যাত্রীবাহী ষ্টীমার এসে লাগে এখানে, তাও রোজ নয় একদিন অন্তর। রেল লাইনের সংযোগ এখনও হয় নি তাই জলপথেই যাতায়াতের ব্যবস্থা।

এ ষ্টীমারে আসছে শোভনা। কেদার সান্যালের মেয়ে। আগে কেউ জানতো না যে, কেদার সান্যালের 'মায়াঘাট সাপ্লাই কর্পোরেশন ছাড়া আর কিছু আছে; টাকা আদায় করে বেড়ানো ছাড়া আর কোন দায় আছে! মেয়ে আছে। জানবেই বা কি করে? শোভনার মা মারা যাবার পর থেকে কেদার বাবু শোভনাকে রেখে দিয়েছিলেন কনভেণ্টে। সেইখানে থেকেই মানুষ হচ্ছে সে, লেখাপড়া শিখছে, বড় হচ্ছে। কেদার সান্যাল কাজের মানুষ। ব্যবসার খাতিরে কখন কোথায় যেতে হয়, থাকা-খাওয়ার ঠিক নেই তাই মেয়েকে কনভেণ্টে রেখেই নিশ্চিন্ত হয়েছেন তিনি।

এবারে যখন মায়াঘাটেই তিনি বেশ পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে নিয়ে হাঁকিয়ে বসলেন তখন মেয়েকে একবার আসতে বলেছেন, তিনি।

শোভনা তৈরী মেয়ে। একাই আসছে স্কুল থেকে।

চাকা ঘুরছে শোভনার; জীবনের চাকা।···এতদিন ছিল স্কুলে, নিশ্চিন্তে পড়াশোনা করতো হৈ-হৈ করতো। এখন ফিরতে হচ্ছে বাবার কাছে। এবার থেকে হয়ত থেকেই যেতে হবে মায়াঘাটে। তারপর···বয়সও বাড়ছে সুতরাং আর একটা জীবনের দিকে ডাক পড়ছে। সেকথার ইঙ্গিতও যেন পাওয়া গেছে বাবার চিঠিতে।···

ডেক-চেয়ারে বসে বসে শোভনা ভাবছিল। মায়াঘাটের কথা সে শুনেছে। জঙ্গল কেটে সহর বসিয়েছে শিবনাথ চৌধুরী তাও শুনেছে।···তারপর পিয়ালী নদী···নতুন খাল···। মানুষের হাতে তৈরী নতুন সহর না জানি কেমন?···

একরকম খবর না দিয়েই আসছিল শোভনা। ঠিকমত তরিখটা না জানা থাকায় কেদার বাবু ষ্টীমার ঘাটে গাড়ীর ব্যবস্থা করতে পারেন নি।

ঘাটে নেমে সামনেই বুকিং ক্লার্ককে দেখেই শোভনা প্রশ্ন তুললে, দেখুন, এখানে কি গাড়ী ঘোড়া বা কুলি কিছু পাওয়া যাবে!

চশমার কোণ দিয়ে বুকিং ক্লার্ক দেখে নিল শোভনাকে। অদ্ভুত এই চশমার ফাঁক দিয়ে ওর দৃষ্টি। সে যেই হোক—তরুণী যুবতী কিংবা নিতান্ত বুড়ো-হাবড়া, লাটসাহেব কিংবা বাড়ীর চাকর ওরা তাকে দেখবে চশমার ফাঁক দিয়ে পয়তাল্লিশ ডিগ্রী কোণ দিয়ে।

বললে, আজ্ঞে গাড়ীঘোড়া এখানে কোথায়? একি আমাদের কোলকেতা পেয়েছেন? আহিরীটোলার ঘাটে দুটি বছর কাজ করেছি, ...হ্যাঁ সেখানে কাজ করে সুখ আছে বটে। এক একখানা ষ্টীমার যেন বাগানবাড়ী...কি বলবো আপনাকে!

শোভনা এই অপ্রত্যাশিত কথার মধ্যে অতিষ্ঠ হয়ে বিরক্তস্বরে বলে, আপাততঃ বলুন দেখি, একটা কুলি দিতে পারবেন?...

—আজ্ঞে, কুলি কোত্থেকে দেবো বলুন?...এই ত দুটি লোক দেখছেন ষ্টীমারের মালখালাস করেই উঠতে পারে না...হ'ত আমাদের কোলকেতা আপনাকে কথাটি বলতে হত না, বুঝেছেন, মাঠাকরুণ...। তবে ঘণ্টা তিনেক যদি অপেক্ষা করেন...

—বলেন কি? তিন ঘণ্টা এখানে বসে থাকতে হবে!

—আজ্ঞে, তা হবে বই কি একরকম!

টমটম হাঁকিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে সোমনাথ। সকালের দিকে পিয়ালী নদীর ধার দিয়ে বেড়ানো তার অভ্যেস। ষ্টীমার ঘাটের পাশ দিয়ে যেতে যেতে শোভনাকে বুকিং ক্লার্কের সঙ্গে কথা বলতে দেখে স্বাভাবিক আগ্রহে এগিয়ে এল। ওদের কথার অনেকটাই সে শুনতে পেয়েছিল। তাই সাহস করে উপযাচক হয়ে বললে, দেখুন যদি কিছু মনে না করেন...আপনি কি কুলি খুঁজছেন?

ঘাড়টা অদ্ভুতভাবে ফিরিয়ে চোখের কোণটা ঈষৎ কাঁপিয়ে শোভনা বল্লে, মোট বইবার জন্যে লোকে কুলি ছাড়া ভদ্রলোক খোঁজে না!...

—তা কুলি ত এখানে পাবেন না।

বুকিং ক্লার্ক যেন উপচে পড়লো। আঁজ্ঞে আমিও ত' সেই কথাই এঁকে বোঝাচ্ছিলাম এতক্ষণ। হত আমাদের কোলকেতা···শুধু কুলি কেন ট্রাম, মোটর—ছ্যাকরা গাড়ি যায় রিস্কা পর্যন্ত···

—থামুন আপনি! শোভনা জোর দিয়ে বলে।

সত্যি সত্যিই একেবারে থেমে যায় লোকটা।

সোমনাথ বলে, দেখুন আপনার যদি আপত্তি না থাকে আপনাকে আমি পৌছে দিতে পারি···গাড়ি আছে···

—ভাড়া?···

—ভাড়া! তা ত' বলতে পারবো না। ভাড়া নিয়ে কখনও কাউকে গাড়ীতে চড়াই নি!

—ভাড়া না দিয়ে আমিও কারও গাড়ীতে চড়ি নি—

—ওঃ তবে ত' মুস্কিল দেখছি। ভাড়া নিতে হলে আপনার কাছ থেকে ত' অল্প নিতে পারবো না···সেটা হয়ত ভালোও দেখাবে না···

—দেখুন তর্ক করবার সময় আমার নেই। আমি হেঁটেই যেতে পারবো। শোভনা যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়ায়।

—কিন্তু আপনার ঐ জিনিষগুলো? সাহায্য করবো কি?

—ধন্যবাদ। নিজের ভার নিজে বইবার অভ্যাস আমার আছে। বলতে বলতে শোভনা স্যুটকেশটা তুলে নেয় নিজ হাতে।

পেছন থেকে ক্লার্কের গলা শোনা যায়,—আঁজ্ঞে—তা ছাড়া আর উপায় কি বলুন?···হতো আমাদের কলকেতা—

বেড়ানো শেষ করে ফিরছিল সোমনাথ। পথে কেদার সান্যালের বাড়ী। কেদার সান্যাল ওকে দেখেই একেবারে গলে পড়লেন। উনি খুব স্নেহ করেন সোমনাথকে।

—আরে আরে সোমনাথ যে! বেড়িয়ে ফিরছো নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ··· দেরী হয়ে গেল আজ!

—আরে এসো এসো বাড়ীর ভেতরে এসো···বাইরে থেকে চলে গেলে চলবে না।

—কিন্তু—

—কিন্তু ফিন্তু নয়···একটু চা টা খেয়ে যাও।

গাড়ী থামিয়ে সোমনাথ নেমে এসে কেদার সান্যালের বাড়ীতে গিয়ে ঢোকে।

কেদার সান্যাল বলেন, এস বাবা এস···এই দেখো একটু নতুন করে আবার সব গোছগাছ করলাম। মেয়েটা আবার আজ কালের মধ্যে কবে এসে পড়ে ঠিক নেই।

—দিন ঠিক করে কিছু লেখে নি বুঝি?

—কিছু না কিছু না···ঐ রকম পাগলা মেয়ে···কিন্তু ভারি কেতাদুরস্ত···এলে পরে দেখবে। আচ্ছা বাবা, তুমি এখন বোসো আমি একটু চায়ের জোগাড় দেখি। হারাধন···ওরে হারাধন···বলতে বলতে কেদারবাবু বাড়ীর ভেতর চলে যান।

সোমনাথ বসে বসে ভাবছিল শোভনার কথা। নাম-পরিচয় কিছু জানা না থাকলেও মেয়েটা বেশ দাগ কেটে গেছে মনের মধ্যে। এরকম সপ্রতিভ মেয়ে বাঙ্গালীর ঘরে ক'টা মেলে? রীতিমত বুক ফুলিয়ে লড়াই করে গেল সোমনাথের সঙ্গে?

—এটা কি কেদারবাবুর বাড়ী?

চমকে উঠলো সোমনাথ মেয়েলি গলা শুনে। আশ্চর্য, দরজার সামনে শোভনা দাঁড়িয়ে।

—হ্যাঁ।

—তিনি বাড়ী আছেন বোধ হয়?

—আছেন বলেই ত জানি। খবর দিতে হবে কি? বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বলতে চেষ্টা করে সোমনাথ।

—না, দরকার নেই। আমি নিজেই সেটা পারবো।

—মাপ করবেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো। দাম দিয়ে ছাড়া কারো কোন সাহায্য কি আপনি নেন না?

—আমিও তা হলে আপনাকে প্রশ্ন করি, আমি মেয়ে বলেই কি এ কথাটা আমায় জিজ্ঞাসা করছেন?

খুব দ্রুতগতিতে গাড়ী চালাতে চালাতে হঠাৎ ব্রেক কষলে গাড়ীর ভেতরকার লোকেরা যেমন হুড়মুড় করে গড়িয়ে পড়ে, সোমনাথের মনে হল ওর মনটা যেন হুড়মুড় করে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। কি অদ্ভুত এই মেয়েটার কথাবার্তাগুলো। বলল, এ রকম সন্দেহ কেন?

—কারণ আত্মসম্মানটা বোধ হয় আপনাদেরই একচেটে। আমাদের ভার হিসেবে বইতে না পারলে আপনাদের পৌরুষে বাধে, তাই নয় কি?

সোমনাথ কোন কথা খুঁজে পাবার আগেই কেদারবাবু এসে ঢুকলেন ঘরের মধ্যে, পেছনে এল হারাধন খাবারের থালা নিয়ে।

শোভনাকে দেখেই কেদারবাবু বললেন, আরে কি আশ্চর্য!

—আজ্ঞে যথার্থ আশ্চর্য! হারাধনও যোগ দেয়।

শোভনা এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করে কেদার সান্যালকে।

—থাক্ মা থাক্। তুই আজকেই এসে পড়বি ভাবতেই পারি নি! এইটি আমার মেয়ে শোভনা বুঝেছ সোমনাথ•••এরই কথা তোমায় বলছিলাম।

—ও, ইনিই!

হেসে উঠে শোভনা বলে, আপনি যেন ভয়ানক হতাশ হলেন মনে হচ্ছে!

—না হতাশ ঠিক নয়···তবে···আমি···মানে আপনাকে একটু অন্য রকম কল্পনা করেছিলাম!

অর্থাৎ আমার এমন 'যুদ্ধং দেহি' মূর্তিটা আপনার বিশেষ পছন্দ নয়, এই ত?···

—না না তা নয়! মানে আমার মনে ধারণা হয়েছিল ফ্রক ছাড়িয়ে শাড়ী পর্যন্ত এখনো আপনি পৌঁছন নি।

অতিকষ্টে টেনে টেনে কথাগুলো শেষ করে সোমনাথ।

হো-হো করে হেসে ওঠে শোভনা।—আপনার কল্পনাকে এভাবে ক্ষুন্ন করার জন্যে দুঃখিত। এ ছাড়া আর কি বলতে পারি?

কেদারবাবু বলে উঠলেন, বাঃ তোরা ত বেশ আলাপ করে ফেলেছিস দেখছি।

সত্যিই ওদের মধ্যে আলাপ জমে গেছে বেশ। সেটা কিছু বিচিত্র নয়, কেন না বয়সটা ওদের পরস্পরের সান্নিধ্য নিবিড় করে অনুভব করবার মত।

সোমনাথের মনে নতুন করে জীবনের স্বাদ লাগ্‌ছে। রক্তের অন্তল তলে লুকিয়ে আছে চৌধুরী বংশের সুপ্ত উত্তেজনা। তাদের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলে মধ্যে মধ্যে মনের ভেতরে। শিবনাথের কঠিন আদর্শ, জগতে যারা সবচেয়ে সাধারণ স্তরে বাস করে তাদের সুখদুঃখে নিজেকে এক করে, এক হয়ে মিশিয়ে থাকা—সোমনাথের মনের এক অজানা কোণে সেটার বিরুদ্ধে নালিশ ওঠে। তার থেকে ঢের ভাল লাগে টমটমের ট্যাবগে ঘোড়াটাকে নিজের শক্তি দিয়ে, চাবুক উঁচিয়ে শাসন করা, নিজের আয়ত্তে এনে ইচ্ছামত চালিয়ে নিয়ে যাওয়া; ঘোড়ার পিঠে হাত বুলিয়ে নয়!

শোভনাকে নিয়ে সোমনাথ বেড়াতে যায় পিয়ালী নদীর ধার দিয়ে। হালকা-হাওয়ায় শোভনার চুল ওড়ে, আবার সন্ধ্যের দিকে অল্প হিমে ভিজে লেপটে যায় পরস্পরে জড়াজড়ি করে! এই সব পরিবর্তনগুলো সোমনাথের দৃষ্টি এড়ায় না।

নদীর ধারে মায়ার সমাধিক্ষেত্রে বসে বসে ওদের গল্প জমে। সোমনাথ মায়াঘাটের ইতিহাস শোনায় শোভনাকে। কবে তার জন্ম হল জঙ্গল কেটে। তারপর কি করে খাল কাটা হল, কেদার সান্যাল এলেন। তারপর সেই সন্ন্যাসীর কথা···লুপ্ত গঙ্গার গল্প।

আপনার বাবা মানুষ, না দেবতা সোমনাথবাবু? শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময়ে প্রশ্ন করে শোভনা।

—লোকে ত' দেবতাই বলে!

—আর আপনি?

—হঠাৎ আপনার এ কৌতূহল? প্রশ্ন দিয়ে এড়াতে চায় সোমনাথ শোভনাকে।

—না কৌতূহল নয়, ও এমনিই বলছিলাম!···কিন্তু একটা মানুষ কি করে এত সব করলেন···এ যে গল্পের চেয়েও বিস্ময়কর!

—হ্যাঁ! তবে বাবার সঙ্গে আর যাঁরা ছিলেন তাঁদের কথাও স্বীকার করতে হবে···যেমন আমাদের মাষ্টারমশাই···তারপর আমাদের সাধন··· এরা সব অদ্ভুত খেটেছে। তারপর এলেন আপনার বাবা। তিনি এসেই কি অল্প সময়ের মধ্যে চেহারা ফিরিয়ে দিলেন মায়াঘাটের···দেবীগঞ্জের চেয়েও বড় হয়ে গেল আমাদের মায়াঘাট। মায়াঘাট সাপ্লাই কর্পোরেশনের কাজকর্ম দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন।

—আমি ত যত দেখছি মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি···

—কিন্তু আমি আরও মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি যখন আপনার বাবার গল্প শুনছি। যিনি দোতলার ওপর তিনতলা গাথেন তাঁর থেকেও যিনি সবার আগে ভিত তৈরী করে রেখেছিলেন তাঁর বাহাদুরী আরও বেশী। অন্ততঃ আমার ত' তাই মনে হয়।

—তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু যখন আরও বিবরণ সব জানবেন তখন দেখবেন এই মায়াঘাট সাপ্লাই কর্পোরেশনেরও একটা যথেষ্ট মূল্য আছে। অথচ আমাদের এখানকার কাগজ 'ভারত জ্যোতি' কি রকম বিশ্রীভাবে আক্রমণ করছে ওদের···এই আজকের কাগজেই এমন একটা কার্টুন দিয়েছে—

—কেন ?···

—কেন আর কি। ওরা বলে মায়াঘাট সাপ্লাই কর্পোরেশন নাকি নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে এসব ব্যবসা বাণিজ্য সব হাত করতে চাইছে ···মায়াঘাটের উন্নতির জন্যে নয়···এই সব বাজে কথা···

—কিন্তু স্বার্থ বুদ্ধি না থাকলে ব্যবসাই বা চলবে কি করে বলুন? টেনে টেনে হেসে উঠলো শোভনা।

—আপনি হাসছেন, কিন্তু আমার মতে সকল জিনিষকে এরকম খারাপ দিক থেকে দেখাটা মোটেই ঠিক নয়।···ওরা কি বলতে চায় এসবের কোন প্রয়োজন নেই ?···

—আপনারা তাহলে বাধা দেন না কেন ?

—একদিন হয়ত তাই দিতে হবে। কথাটা শেষ করেই ভয়ানক গম্ভীর হয়ে পড়ে সোমনাথ!

সহরের একদিকে এক কোণে ভারতজ্যোতি কাগজের অফিস। ভাঙ্গা ঘর ভাঙ্গা মেসিন আর ভাঙ্গা টাইপ দিয়ে ছাপা হয় কাগজ। এর বেশী সংস্থান নেই ওদের। এদিকে ভাঙ্গা মন যাদের আর যারা মানুষের মধ্যে কোণঠাসা হয়ে পড়ে আছে তাদের নিয়েই কারবার ওদের। কিন্তু তবু এই ভাঙ্গা নড়বড়ে অক্ষরে এত বড় শক্ত আর সত্যি কথাগুলো কি করে যে ওরা বলে সেইটেই আশ্চর্য!

প্রেসের মালিক ভূপতি চাটুয্যেকে বাইরে থেকে চেহারা দেখে ধরা শক্ত যে এই লোকটাই এতবড় কাগজটাকে চালাচ্ছে। বড় জোর মনে হবে কাগজ-অফিসের বেয়ারাগোছের কিছু একটা হবে।

ভুল হল কেদার সান্যালেরও। সেই কার্টুনওয়ালা কাগজখানা হাতে নিয়ে উনি দেখা করতে এসেছিলেন প্রেস-মালিকের সঙ্গে।

—ওহে শুনছো, তোমাদের বাবুকে একবার ডেকে দাও ত?

—বাবু! বাবু কে?

—আহা…মানে এই ভারতজ্যোতি কাগজ যিনি চালান—

—কাগজ আমিই চালাই!

—তুমি…মানে আপনিই কাগজ চালান! আপনার নামই তাহলে…

—ভূপতি চাটুয্যে।

থতমত খেয়ে গেলেন কেদার সান্যাল। এই ময়লা-ছেঁড়া কাপড় জামা পরা ছোট লোকের মত লোকটাই ভূপতি চাটুয্যে…। এই হতভাগাটার এতখানি সাহস…! …নিজেকে সামলে নিতে এক মিনিট লাগে কেদার বাবুর। তিনি পাকা লোক!

—নমস্কার…নমস্কার ভূপতিবাবু!…নমস্কার শুধু আপনাকে নয়… আপনার কলমটিকেও—

—মশায়ের কি কাজে আসা হয়েছে?

আশ্চর্য লোক ত! একটা প্রতিনমস্কারের ভদ্রতারও প্রয়োজন বোধ করলে না, একেবারে কাজের কথা পেড়ে বসলো

কিন্তু তবু কেদার সান্যালকে বিচলিত হলে চলবে না।

—হেঁ হেঁ এই এসেছি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে। আমাদের পরস্পরের মধ্যে জানাশোনা থাকা দরকার, নৈলে কত রকম ভুল-ভ্রান্তিই না হতে পারে।···বলুন না···হতে ত পারে!···

—ভুল ভ্রান্তিটা কি রকম?

—এই দেখুন না আজকের কাগজে না জেনে শুনে মায়াঘাট সাপ্লাই কর্পোরেশন এর বিরুদ্ধে যে প্রবন্ধ আর যে ছবি ছাপা হয়েছে—

না জেনেশুনে কেন বলছেন? ও ছবি আর প্রবন্ধ জেনে শুনেই ছাপা হয়েছে কেদার বাবু!

কথা ত নয়, লোকটা যেন কোমর বেঁধেই রয়েছে ঝগড়া করবার জন্যে। তবু সামলে চলতে হয় কেদার বাবুকে।

—ও!···তা যাক্ গে। এখন কথা হচ্ছে আমাদের মধ্যে একটা মিটমাট হয়ে যাওয়াই ভালো নয় কি? ধরুন আমার সঙ্গে আপনার একটা বোঝাপড়া হয়ে গেল···

—বোঝাপড়া? পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় লোকটা কেদার সান্যালের দিকে! বিস্ময়ে এবং সন্দেহে!

—হ্যাঁ, বোঝাপড়া!···মানে·· তাহলে ভেবে দেখুন আপনার এই ছোট প্রেস কত বড় হয়ে উঠতে পারে!···টাকার জন্যে ভাববেন না ভূপতি বাবু···বুঝেছেন···শুধু আমার কথাটা ভেবে দেখুন একবার—

—বুঝে আমি সবই দেখেছি কেদার বাবু। কিন্তু আপনিই আমাকে বুঝতে পারেন নি···

লোকটা যতদূর সম্ভব কম কথা বলে বটে কিন্তু একবার যখন বলতে আরম্ভ করে তখন যেন থামতে চায় না···।

বলে চলে ভূপতি, বুঝেছেন···ভারতজ্যোতি কাগজ তোতাপাখী নয় যে পোষ মানিয়ে যা বলাবেন তাই বলবে! ভারতজ্যোতি সত্যের কারবার করে এবং করবে···এই সাধনা নিয়েই আমি মায়াঘাটে বাসা বেঁধেছি! টাকার লোভ দেখিয়ে কি এই সাধনা কিনে নেওয়া যায় মনে করেন?···আচ্ছা নমস্কার।

কথা ত' নয় মুঠো মুঠো বিষ! সর্বাঙ্গ জ্বালা করতে লাগলো কেদার বাবুর!

—বেশ! কিন্তু মনে রাখবেন ভূপতিবাবু যে আপনার এই শিশু প্রেসটিকে আমি বাঁচিয়ে রাখতেই চেয়েছিলাম।

—বাঁচিয়ে রাখতে আমিও চাই কেদারবাবু, তা বলে কাউকে খুষি দিতে পারবো না!

পায়ের তলা থেকে মাটিটা সরে যাচ্ছে যেন! এই এত তুচ্ছ লোকটা এতু উচ্চৈস্বরে কথা বলতে পারে?

পারলেও কেদার সান্যাল আজ পর্যন্ত সে কথা বিশ্বাস করতে পারতেন কি? চোখে না দেখা পর্যন্ত?···

ব্যাপারটা কেদার সান্যাল গিয়ে তুললেন শিবনাথের কাছে।

—দেখেছেন শিবনাথবাবু···ভারতজ্যোতির কাণ্ডখানা একবার দেখেছেন! মায়াঘাট সাপ্লাই কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে খেউড় গাইতে কিছু আর বাকী রাখেনি! আমি ওসব গায়ে মাখি না অবশ্য—কিন্তু, আসল কথা কি জানেন, মায়াঘাটের সত্যিকার উন্নতি ওরা চায় না··· কখনো চায় না···নইলে আমাদের বিরুদ্ধে—। ···আচ্ছা আপনিই বলুন, মায়াঘাটের জলের কল বসানো নিয়ে ত' কথা, সেটা কার হাত দিয়ে হল না হল···তাতে কি আসে যায় বলুন?···

কেদার সান্যাল আরও কিছু হয়ত বলে যেতেন কিন্তু শিবনাথ বাধা দিয়ে বসলেন। বললেন, আসে যায় বই কি কেদার বাবু। মায়াঘাটের সর্বসাধারণের তৃষ্ণা মেটাবার ভার যদি নিতে হয় তবে সর্বসাধারণের প্রতিষ্ঠান মায়াঘাট মিউনিসিপালিটিকেই দেওয়া উচিত!

কথাগুলো শান্তস্বরে বল্লেও যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। একটু যেন অপ্রস্তুত হয়েই কেদারবাবু বললেন, আপনিও ঐ কথা বলছেন?

—তা সকলের স্বার্থের দিক থেকে চিন্তা করলে আমাকে সে কথা বলতে হবে বই কি! বুঝছেন ত ব্যাপারটা! এতবড় একটা জায়গাতে জল সাপ্লাই করতে হবে···কতবড় একটা দায়িত্ব···কতবড় একটা অর্গানিজেশন···একটা মিউনিসিপালিটির হাতে না দিয়ে···

—কিন্তু মিউনিসিপালিটি ত বারোয়ারী ব্যাপার! আপনি দেবতা হতে পারেন শিবনাথবাবু কিন্তু দুনিয়ার সবাই ত আর দেবতা নয় মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের পঁচিশজন সভ্যের পঁচিশ রকম স্বার্থ, পঁচিশ রকম মতামত। এ যদি উত্তরে যেতে চায়, ও যাবে দক্ষিণে! সবাই আপনার মতে সায় দেবে বলে আশা করেন?...

—সায় যদি না দেয়, তবে সবাইকে আমাদের মতে আনবার চেষ্টা করতে হবে কেদারবাবু! সেটাই ত আসল কাজ!

—অপরাধ নেবেন না শিবনাথবাবু, বয়সে আপনার চেয়ে আমি প্রবীণ! বহু ঠেকে এই শিখেছি যে, কোন বড় কাজ করতে হলে শুধু আদর্শ নিয়ে চলে না...কিছু কার্যকরী বুদ্ধি দরকার।...আপনিই ভেবে দেখুন, যেখানে নানা মুনির নানা মত...নানা স্বার্থ, সেখানে কোনদিন কোন বড় কাজ হতে পারে?...তার চেয়ে বলি কি, এ ব্যাপারটা আমাদের হাতেই ছেড়ে দিন...মায়াঘাটের জলের সমস্যা জলের মত সহজেই মিটে যাবে!

এক মিনিট চুপ করে রইলেন শিবনাথ। তারপর মুখ তুলে কঠিন স্বরে বলে উঠলেন, জলের সমস্যা হয়ত মিটে যাবে কেদার বাবু কিন্তু এতবড় অন্যায় কোনদিন মিটবে না... ।...

কেদার সান্যাল চমকে গেলেন। এতদিনের পরিচয়ের মধ্যে অন্তরে যাই থাক শিবনাথ মুখের ওপর এমন কথা কোনদিন বলেন নি। এমন করে রুখে দাঁড়ান নি একদিনও।

দেশলায়ের খোলটা ছিল, কাঠিও ছিল। কেবল দুটোকে ঘষে আগুণ জ্বলে নি এতদিন। আজ জ্বললো!

—অন্যায়! কি বলছেন শিবনাথ বাবু? উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন কেদার সান্যাল!...

—জল বিধাতার দান, কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। মায়াঘাটের জনসাধারণের কাছে সেই জল বেচে কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা দল বিশেষকে লাভ করতে দেওয়াটাকে আমি অন্যায় বলেই মনে করি!

না, আজকের শিবনাথকে টলানো যাবে না। আজকের শিবনাথ সেই যে পদে পদে অশুভের সঙ্গে জীবন দিয়ে লড়ে এসেছে। পেছিয়ে আসে নি এক পা-ও!

—আপনি আর একবার ভেবে দেখুন শিবনাথবাবু! পাঁচভূতের কারবার মিউনিসিপালিটিকে এতবড় কাজের ভার দিলে মায়াঘাটের জলের তেষ্টা বোধ করি এ জন্মে আর মিটবে না!

—তবু নিজের ব্যবস্থা নিজেই করতে শেখা ভাল। তেষ্টায় গলা শুখিয়ে কাঠ হয়ে গেলেও মায়াঘাট মিউনিসিপালিটিকে আজ সেই চেষ্টাই করতে হবে··· ।

—এটা সম্পূর্ণ জিদের কথা। টেবিলের ওপর মস্তবড় একটা চাপড় মেরে নিজের ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলবার শেষ ব্যর্থ চেষ্টা করলেন কেদার সান্যাল!

—জিদ নয় কেদার বাবু···এ আমার বিশ্বাস···এ আমার আদর্শের কথা!

এর পর কথা চলে না। ছোট্ট একটা 'বেশ' বলে কেদারবাবু দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। এগোতে গিয়ে পা-ছুটো যেন তাঁর টলছে। মাথাটার ভার যেন অতিরিক্ত মনে হচ্ছে!···

—শুনুন কেদারবাবু। পিছন থেকে শিবনাথ ডাকলে।—আপনাকে মানতে হবে এ অন্যায়···নিশ্চয়ই অন্যায়! এমনি করে ছোট ছোট স্বার্থের দলাদলিতে বহু নগর, বহু সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেছে। বিশ্বাস করুন···বিশ্বাস করুন আপনি, আমি যা বলছি তা সত্যি···তা ন্যায়। আপনি আমার পাশে থাকুন, সহায়তা করুন···দেখবেন মায়াঘাটের শ্রীসমৃদ্ধি বেড়ে উঠেছে···

শিবনাথের সব কথা শোনবার মত ধৈর্য কেদার বাবুর নেই। তাই শিবনাথের কথা শেষ হবার অপেক্ষা না রেখেই তিনি বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে। আর যাবার সময় বলে গেলেন, আপনার পাশে থাকি আর না থাকি আমার বুদ্ধি বিবেচনায় যা বলবে আমায় সে কাজ করেই যেতে হবে··· ।···

শোভনা বসে বসে বই পড়ছিল এমন সময়ে ঝড়ের মত সোমনাথ এসে ঢুকলো। বল্লে, শুনেছেন ?

—কি শুনবো ? বই থেকে মুখ না তুলেই প্রশ্ন করলে শোভনা।

—যে আপনার বাবার সঙ্গে আমার বাবার ঝগড়া হয়ে গেছে !

—কি নিয়ে হল ?

—জলের কল বসানো নিয়ে। আপনার বাবার ইচ্ছে ছিল মায়াঘাটে জলের জন্য একটা পাম্‌পিং স্টেশন বসান কিন্তু আমার বাবাকে রাজী করাতে পারলেন না।

—রাজী করাতে পারলেন না ? আচ্ছা মায়াঘাটে এসে অবধি আপনাদের মুখে, বিশেষ করে আমার বাবার মুখে শুনছি শিবনাথবাবু নাকি দেবতুল্য লোক···তিনি দেবতা···কিন্তু যাঁরা দেবতা তাঁরা ত' মানুষের ভালোই চান বলে জানি। তা আপনাদের মায়াঘাটের দেবতা সম্বন্ধে ভক্তের দল একটু বেশী রং ফলায় নি ত ?

হঠাৎ আক্রমণ করে কথা বলা শোভনার স্বভাব। বেশ সাবলীল-ভাবেই তা করে ও। তাই সোমনাথ রাগ করতে পারলে না। বললে, না এ সন্দেহ আপনার মিথ্যে। আপনি ত' তাঁকে দেখেন নি, দেখলে বুঝতেন সত্যিই ভক্তি করবার মত মানুষ তিনি।

—তাহলে পামপিং স্টেশন করতে বাধা দিলেন কেন ?

—আমাদের মায়াঘাট সাপ্লাই কর্পোরেশনকে তিনি জলের কল বসাবার ভার দিতে চান না।

—তা হলে জলের কলগুলো কি আপনিই গজিয়ে উঠবে ?

—তাঁর মতে মায়াঘাট মিউনিসিপালিটিকেই এই ভার দেওয়া উচিত !

—সে ত ভাল কথা ! শোভনা উৎসাহে বইখানা মুড়ে রেখে দেয় টেবিলের ওপর।

—ভালো বই কি ! সে কথা ত' আমিও বলেছিলাম। কিন্তু সান্যাল মশাই যে কথা বললেন সে কথাটাও ভাববার মত !

—কি বললেন বাবা ?

—বললেন আমাদের মিউনিসিপালিটির অবস্থা তুমি ত' জানো না সোমনাথ। না আছে তার টাকার জোর, না আছে মেম্বারদের মতের মিল! ওই বারো ভূতের কারবার দিয়ে এতবড় কাজ হতে পারে না!

তা হলে মায়াঘাটে কি জলের কল হবে না?

—কি করে আর হবে বলুন!

—সত্যিই ত কি করে আর হবে! বাবার মত ভক্ত শিষ্য আর আপনার মত নেহাৎ বাধ্য ছেলে থাকতে সে আশা কোথায়?

—কি করতে বলেন আপনি?

—কি আর বলবো। বাবাকে বলবো আবার আমায় কনভেণ্টে পাঠিয়ে দিতে। বেশ ছিলাম ওখানে, সহরের নামে এই বদগাঁয়ে এসে থাকা আমার পোষাবে না।

—আপনি রাগ করছেন বটে কিন্তু এর প্রতিকার কোথায় বলতে পারেন?

—আছে বই কি প্রতিকার। মাথা ঝাঁকিয়ে সোজা হয়ে বসলো শোভনা। সোমনাথ দেখেছে শোভনা যখন সত্যই উত্তেজিত হয়ে ওঠে তখন অদ্ভুতভাবে মাথা দোলায়। আর তার কপালের দুপাশ দিয়ে দুগুচ্ছ চুল কেমন দুলতে থাকে এলোমেলো ভাবে। কি ভালো যে দেখায় ওকে তখন!

—আছে বই কি প্রতিকার। বলে চললো শোভনা,···মিউনিসিপালিটি বোর্ডের মিটিং এ এই নিয়ে লড়তে হবে···

—বাবার বিরুদ্ধে! সোমনাথ যেন চমকে উঠে ভেতর থেকে!

—কেন নয়! হতে পারেন তিনি দেবতুল্য লোক কিন্তু একা শিবনাথবাবুইত' সমস্ত মায়াঘাট ন'ন! উচিত মনে করলে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত সাহস কি মায়াঘাটে কারও নেই?

—আছে। সাহস যে কোথা থেকে কখন আসে আপনি তা জানেন না! সেই সাহসের জোরেই ছেলে হয়ে বাপের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে আমি আজ পিছিয়ে যাবো না!

—আপনি দাঁড়াবেন শিবনাথবাবুর বিরুদ্ধে আমার বাবার পক্ষ হয়ে···

—হাঁ, আমি কথা দিচ্ছি শোভনা দেবী…

—আপনার নিজের বাবার বিরুদ্ধে…

—বাবার বিরুদ্ধে কি না জানি না, তবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমায় দাঁড়াতে হবে—!

ঠিক এই সময়ে 'শোভনা' 'শোভনা' বলে ডাকতে ডাকতে কেদার সান্যাল এসে ঢুকলেন ঘরের মধ্যে। বললেন, এই যে তোমরা দুজনেই আছো দেখছি। তা আমায় আবার এখুনি বেরোতে হচ্ছে যে…মিটিং আছে বোর্ডের…আমার কোটটা চট্ করে এনে দে ত' মা!

—আমিও আপনার সঙ্গে যাবো সান্যাল মশাই। সোমনাথ এগিয়ে এসে দাঁড়ালো কেদার বাবুর পাশে।

—তুমি যাবে?

—হ্যাঁ। শুধু যাবো না আজ আপনার পাশে দাঁড়িয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করবো!…

—তুমি বলছো কি সোমনাথ! বিস্ময়ে পিছিয়ে আসেন কেদার সান্যাল!

—আমি ঠিকই বলছি সান্যাল মশাই। এতক্ষণ এঁর সঙ্গে আলোচনা করে দেখলাম এটাই আমার করা উচিৎ…।

—বাবার বিরুদ্ধে আমার পাশে দাঁড়াতে পারবে তুমি…এ্যা! বাঃ। বাঃ সোমনাথ, এই ত' বাপকা বেটার মত কথা…। শুনছিস মা? শোন শোন…!… গুরু শিষ্যের এই যুদ্ধের জন্যে মনে মনে আমিও যে তৈরী হয়ে আছি সোমনাথ। শুধু তোমার মত একজনকে পাশে পাবার অপেক্ষায় ছিলাম—

—আজ থেকে আমি আপনার পাশেই রইলাম সান্যাল মশাই!

—ব্যস ব্যস…আর ভয় কি আমার, জিৎ এইখান থেকেই সুরু। এস সোমনাথ…এখুনি মিটিংএ যেতে হবে আমাদের…

বলতে বলতে কেদার সান্যাল বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। সোমনাথও যাচ্ছিল। শোভনা বললে, দাঁড়ান। আমিও যাব আপনাদের সঙ্গে।

—আপনি ?

—হ্যাঁ। মায়াঘাটের দেবতুল্য ভাগ্যবিধাতাকে স্বচক্ষে দেখবার সুযোগটা কেন ছেড়ে দেব ? তা ছাড়া আজকের মিটিংএ আপনাদের এই বিজয় অভিযান শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তাও ত' দেখতে হবে···

শোভনাকে যত বেশী দেখছে সোমনাথ ততই যেন নতুন করে চিনছে। তাই শোভনার এই প্রস্তাবে খুব বেশী অবাক হবার প্রয়োজন সে বোধ করলে না। অনায়াসেই বল্লে—চলুন !

মিটিংএ কিন্তু ফলটা অন্যরকম দাঁড়িয়ে গেল। শিবনাথ বাবুর বিশাল ব্যক্তিত্বের সামনে কেদার সান্যালের ষড়যন্ত্র একেবারে ভেসে চলে গেল।

মনোহর মাষ্টার প্রথমে বলবার জন্যে উঠেছিল। বলছিল, মায়াঘাটে জলের কল হবে এ ত পরম সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু এই সৌভাগ্য যদি আমরা নিজেরা অর্জন করতে না পারি তাতে তার সত্যকার মূল্য কোথায় ? আকাশের দেবতার কাছে আমরা জল চাই, আকাশের দেবতাও খেয়ালমত আমাদের অনুগ্রহ করেন। কিন্তু সে অনুগ্রহের ধারা নেমে আসে ভিক্ষার মত ! কিন্তু নিজের হাতে যখন মাটি খুঁড়ে পাতাল থেকে আমরা জল টেনে তুলি তখন দেবতাও প্রসন্ন হন। সে-জল ভিক্ষার দান নয় সে আমাদের পৌরুষের পুরস্কার ! মায়াঘাটের পিপাসা আমাদের মেটাতেই হবে !

কে যেন বলে উঠলো পেছন থেকে—শুধু কি বাক্যির জোরে ?

—না, শুধু কথা দিয়ে কেন কাজ দিয়েই ! কিন্তু কাজ সুরু করার পূর্বে আমি বলতে চাই, মায়াঘাটের তৃষ্ণা মেটানোর দায় আমাদেরই। পরের কাঁধে এই দায় চাপিয়ে আমরা নিজেদের ফাঁকি দিতে চাই না। আজকের সভায় এই আমার বক্তব্য !

জনৈক কণ্ঠ ; বক্তব্য ত মস্ত, কিন্তু জল কই ?

২য় কণ্ঠ ; এদিকে যে তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেল।

চারিদিক থেকে—জল চাই জল···বক্তৃতা ঢের হয়েছে···ইত্যাদি কলরব উঠতে লাগলো।

গোলমালের মধ্যে উঠে দাঁড়ালেন কেদার সান্যাল।—কেন আপনারা গোলমাল করছেন···দয়া করে থামুন, বলতে দিন আমাকে।

—কলরব একটু স্তিমিত হয়ে গেলে কেদারবাবু সুরু করলেন, আজকের সভায় আমাদের মাষ্টার মশায় প্রাঞ্জল ভাষায় যে সমস্ত বড় বড় কথা বললেন তা শুনে আমাদের জ্ঞানের তৃষ্ণা মিটলেও জলের তৃষ্ণা কিন্তু মিটলো না···

—ঠিক ঠিক। জনতার মধ্যে থেকে কেউ কেউ বলে উঠলো।

—মায়াঘাটের জনসাধারণের পক্ষ থেকে আপনাকে দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করি মাষ্টার মশায়। বাড়ী যখন আমরা তৈরী করি তখন কর্নিক হাতে আমরা কি নিজেরাই লেগে যাই, না রাজমিস্ত্রী ডাকি? বলুন?···যে কাপড়খানা আপনি পরে আছেন তার জন্যে তাঁতির মুখ চেয়ে আপনাকে থাকতে হয় নি? জলের কলের ব্যাপারও তাই! একাজ যাদের সাজে তাদের হাতে এ ভার না দেওয়া আর আপনার জুতো তৈরী করবার জন্যে চামড়া নিয়ে নিজেই সেলাই করতে বসা সমান মূর্খতা নয় কি? আপনারা কি বলেন?

—ঠিক ঠিক।

কেদার সান্যাল তখনও বলে চলেছেন—হাত বাড়িয়ে দায় নেওয়াটা খুব সহজ, কিন্তু দায় বহন করতে হলে কিছু যোগ্যতার দরকার হয়। যাকে যে কাজ সাজে, তাকে সেই কাজের ভার দেওয়াটা অগৌরবের নয়। তাই আমি প্রস্তাব করি মায়াঘাটের জলের সমস্যা মায়াঘাট সাপ্লাই কর্পোরেশনের হাতেই দেওয়া হোক্!···

এইবার শিবনাথ উঠে দাঁড়ালেন। উজ্জল চোখে সকলের দিকে তাকিয়ে নিলেন একবার। তারপর বলতে আরম্ভ করলেন, ভালো কথা, কিন্তু এ মিউনিসিপালিটি আমরা তাহলে কি জন্যে গড়ে তুলেছি বলতে পারেন? শুধু সময়ে অসময়ে এখানে জড় হয়ে বক্তৃতার প্রতিযোগিতা দেওয়াই কি আমাদের লক্ষ্য?···কাপড় বোনবার জন্য তাঁতির মুখ চেয়ে থাকতে হয় জানি কিন্তু সেই কাপড় পরবার জন্যে যদি কারোর ওপর নির্ভর করে থাকতে হয় তার থেকে লজ্জার বিষয় আর কিছু নেই।

জুতো তৈরী করার জন্যে শুধু মুচিকেই আমাদের প্রয়োজন, কিন্তু মুচিকে ডেকে ফরমাস দেওয়ার জন্যে তৃতীয় ব্যক্তির কি প্রয়োজন বলতে পারেন ?···

জনতা—না প্রয়োজন নেই। হিয়ার—হিয়ার···

—জলের কলের বিশেষজ্ঞ আমরা কেউ নই। কিন্তু সে-জন্য এঞ্জিনীয়ার থেকে মিস্ত্রী—যাদের সাহায্য আমাদের দরকার···তাদের ডেকে এনে কাজে লাগাবার ক্ষমতাটুকুও কি আমাদের নেই ? আমাদের সামনে এখন দুটি প্রশ্ন—তৃষ্ণার জল আমরা কি পরের কাছ থেকে দাম দিয়ে কিনবো, না নিজেদের ব্যবস্থা আমরা নিজেরাই করবো ? আমার মনে হয় তৃষ্ণার জল যারা আমাদের কাছে বেচতে চায় তাদের দ্বারস্থ না হয়ে, নিজেদের শক্তির ওপর বিশ্বাস রাখা মায়াঘাটের প্রত্যেকেরই কর্তব্য ! এ বিষয়ে আপনাদের অভিমত জানাতে পারেন !···

কেদার সান্যাল উৎসাহের সঙ্গে বলেন—বলুন বলুন আপনাদের যার যা বলবার আছে বলুন। দ্বিধা করবেন না···আপনাদের মতের সঙ্গে শিবনাথবাবুর অমিল হতে পারে কিন্তু পরের স্বাধীন মতামতের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা আছে।···বলুন আপনারা···

কেদারবাবু তাঁর নিজের দলের দিকে আর একবার সোমনাথের দিকে আর বাকি সকলের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন।

জনতা নিশ্চুপ।

সূর্যের আড়ালে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র যেন লুপ্ত হয়ে গেছে।

—তাহলে—সুরু করলে শিবনাথ—তাহলে আপনাদের কারও কিছু বলবার নেই আশা করি। মায়াঘাটের জলের কলের ভার তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে মায়াঘাট মিউনিসিপালিটিকেই দেওয়া হল।···আচ্ছা আজকের সভা ভঙ্গ হোক !

সভা ভাঙ্গলো এবং সভার সঙ্গে সঙ্গে কেদার সান্যালের চক্রান্তও ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

—মানুষ নয়তো ওরা সব ভেড়ার দল ! রাগে গর্‌গর্‌ করতে

করতে বেরিয়ে এলেন কেদার সান্যাল।—আড়ালে আমার কাছে কত কথাই না বলে গেল। আর শিবনাথবাবু উঠে দাঁড়াতেই সব একেবারে চুপ—নির্বাক। পেছন পেছন শোভনা আসছিল। তাকে লক্ষ্য করে বললেন, আরে শিবনাথবাবুকে ভক্তি কি আমি তোদের চেয়ে কম করি …কিন্তু তাই বলে সত্যের ডাক যখন আসে তখনও তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে যদি সাহস না করি তাহলে কিসের ভক্তি?…বুঝেছিস্ মা ওতো ওদের ভক্তি নয়… ভয় ভয়।

শোভনার মনটা এমনই বিচলিত হয়ে ছিল তার ওপর কেদার বাবুর কথা শুনে একটু যেন বিরক্ত হয়েই বললে, ওদের মিছে কেন দোষ দিচ্ছ বাবা? শিবনাথবাবুর সে শক্তি, সে তেজ আছে বলেই ভক্তিই বল আর ভয়ই বল ওরা না করে পারে না। এতদিন তোমাদের মুখে মুখেই যা শুনছিলুম আজ ত' নিজের চোখেই দেখে এলাম। তাঁর সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে এমন তোমাদের মধ্যে কেউ নেই!

শোভনার কথাগুলো যে কেদারবাবুর মনে ধরবে এমন নয়। তবু যথাসম্ভব নরম স্বরেই তিনি বল্লেন, সে কথা ত' মিথ্যে নয় মা তাঁর কাছে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার স্পর্দ্ধা কোথায় পাবো? তবে এও বলে রাখছি, কেদার সান্যাল কখনও হার মানতে শেখে নি। মাথা আমি নীচু করেই রাখবো তবু একদিন এই হেঁট মাথার মর্ম বুঝে শিবনাথবাবুকে তাঁর নিজের ভুল স্বীকার করতেই হবে—

—মাথা নীচু উঁচু করার কথা জানিনে তবে নিজের চোখে যা দেখে এলাম তাকে অস্বীকার করতে পারছি না। তাঁর সঙ্গে পাল্লা দেবার মত কেউ নেই তোমাদের মধ্যে!

কথাগুলো শেষ করে শোভনা আর দাঁড়ালো না, হন হন করে এগিয়ে গেল।

সোমনাথের সঙ্গে দেখা হতেই সোমনাথ বললে, চলুন আপনাকে পৌঁছে নিয়ে আসি। গাড়ী ত' দাঁড়িয়ে রয়েছে।

শোভনা বল্লে, আপনার বাবা?

—ও, বাবার কথা বলছেন! বাবার যেতে দেরী আছে এখনও

আর তাছাড়া বাবা গাড়ী ব্যবহার করেন না পারতপক্ষে।···অবশ্য আপনার যদি আপত্তি থাকে—

—না আপত্তি আর কি? চলুন···।

গাড়ীতে সোমনাথই প্রথম কথা তুললে। বললে, আমার বাবাকে দেখলেন?

—দেখলুম।

—কি মনে হল?

—মনে হল তাঁর সঙ্গে লড়াই করবার ক্ষমতা আপনাদের নেই। সত্যি, একটা কথা পর্যন্ত বলতে পারলেন না? একেবারে দাঁড়িয়ে হেরে গেলেন!

—আমাদের এ হার আপনার এতখানি লাগবে আমি ভাবি নি···

—হারের চেয়ে বেশী লেগেছে আপনাদের অকর্মণ্যতার পরিচয়···।

শোভনার মত মেয়ে যে মুখের ওপরই ওদের অকর্মণ্য বলে যাবে তাতে সোমনাথ কিছুমাত্র অবাক হল না। শোভনাকে আরো একটু উত্তেজিত করার চেষ্টাতেই বললে, এ আপনি অন্যায় অভিযোগ করছেন ···আমাদের যা করবার সবই ত' আমরা করেছি—

—ছাই করেছেন! আদর্শ নিয়ে সত্য নিয়ে আপনারা নাকি লড়াইয়ে নেমেছিলেন···কোথায় আপনাদের মধ্যে সে বিশ্বাসের জোর? কোথায় সে সাহস? তা থাকলে শিবনাথবাবুর সামনে বানের জলে খড় কুটোর মত আপনারা ভেসে যেতেন না। আশ্চর্য! সারা মায়া-ঘাটের মধ্যে একটা মানুষ নেই? শুধু শ্রদ্ধা আর ভক্তি, এ ছাড়া অতবড় একটা ব্যক্তিত্বের সমান হয়ে দাঁড়াবার লোভও কারো হয় না!

অবাক হয়ে চেয়ে দেখে সোমনাথ শোভনার মুখের দিকে। উত্তেজিত হয়ে উঠছে শোভনা আর সেই সঙ্গে ওর স্বভাব মত মাথাটা অদ্ভুত-ভাবে উঠেছে দুলে আর সেই দোলা খেয়ে কপালের দুদিক থেকে দুটি চুলের গুচ্ছ ঝুলে পড়ছে সামনের দিকে।···তার ওপর আবার অস্তায়মান সূর্যের লাল আলো এসে পড়েছে ওর মুখের ওপর। গোধুলির আলো

একেই মেয়েদের মুখের ওপর একটা অপূর্ব শ্রী ফুটিয়ে তোলে তার সঙ্গে আবার যোগ দিয়েছে শোভনার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য !

—অমন করে চেয়ে দেখছেন কি ? সোজাসুজি প্রশ্ন করে বসলো শোভনা ।

ঝপ করে কালো হয়ে গেল সোমনাথের মুখ । বললে, সাহস করে বলব ?

—এমন একলা আমায় পেয়েও যদি সাহস দেখাতে না পারেন তাহলে সাহস আর দেখাবেন কোথায় ?

না, সোমনাথ স্বীকার করতে বাধ্য হল, অবশ্য মনে মনেই, যে শোভনার মত মেয়ে শুধু যে সে চোখে দেখে নি তা নয়, এরকম মেয়ে তার কল্পনার বাইরে ।

—তাহলে সত্যি কথাটাই শুনুন—একটু কি যেন ভেবে নিয়ে সোমনাথ বলতে স্বরু করলে,—সাহস শক্তি কিছুই আমার খুব বেশী নেই জানি, কিন্তু আজ আমার মনে হচ্ছে আপনি যদি পাশে এসে দাঁড়ান তাহলে জীবনে কোন দিন কোন সাহসের অভাব আমার হবে না—

কথাটা শেষ করে শোভনার মুখের দিকে তাকাতেই সোমনাথ যেন হঠাৎ লজ্জা পেয়ে গেল । বললে, হঠাৎ এভাবে কথাটা বলে ফেলার জন্যে যদি কিছু মনে করে থাকেন তাহলে ক্ষমা চাইছি আমি—

—না মনে আমি কিছু করিনি তবে এরকম কথার জন্যে সত্যিই আমি প্রস্তুত ছিলাম না—

—আমিও ছিলাম না শোভনা···আগের মুহূর্তেও এ কথা তোমাকে বলতে পারবো আমিও ভাবিনি । সত্যিই তুমি আমার জীবনের প্রেরণা হতে পারো, তোমার কাছ থেকে সাহস পেলে হয়ত আমিও অসাধ্য সাধন করতে পারি—

—আমি যা তার চেয়ে হয়ত আপনি আমাকে অনেক বড় করে দেখছেন·· তবু আপনার জীবনে যদি সত্যিই আমার প্রয়োজন আছে মনে করেন—

কথাটা শেষ না করেই মাথাটা হেঁট করে শোভনা স্তব্ধ হয়ে গেল ।

এতদিন শোভনার সঙ্গে মিশছে সোমনাথ কিন্তু এই প্রথম শোভনাকে মাথা নীচু করতে দেখলো কথা বলতে গিয়ে।

এবং দেখে কি যে হয়ে গেল ওর মনের মধ্যে,—একটা কথাও বলতে পারলো না। অথচ সেদিন সোমনাথ কি না বলতে পারতো শোভনাকে …কি না করতে পারতো নিজেকে নিয়ে…

এমন এক একটা মুহূর্ত আসে যে বহু পরিচিত লোকের সঙ্গে বহুদিন পরে দেখা হলে অনেক কথা যখন বলবার জন্যে জমা হয়ে থাকে তখন কার্যক্ষেত্রে কিছুই হয়ত বলা হয় না।

প্রথম কলের মুখ খুলে দিলে এত তোড়ে জল আসে যে জলের বদলে অনেকখানি হাওয়াই শুধু ভক্ ভক্ করতে থাকে।

সোমনাথ শুধু আকাশের দিকে চেয়ে দেখলো বিলীয়মান সূর্যটা থেকে অনন্ত রক্তিম প্রবাহ যেন বন্যার মত ভেসে আসছে হু হু করে।

কিন্তু শিবনাথ মত দিতে পারেন নি এ বিয়েতে।

কেদার সান্যাল নিজে গিয়ে দেখা করে কথাটা পাড়বার জন্যে। কিন্তু শিবনাথ জবাব দিয়েছেন, আমায় ভেবে দেখতে দিন সান্যাল মশাই! এদিক দিয়ে আমি কখনো ভেবে দেখিনি।

এরপর সোমনাথ গেছে। শিবনাথ বলেছেন, আমি তোমার ওপর রাগ করিনি সোমনাথ কিন্তু আমার মতামতের কি খুব বেশী প্রয়োজন আছে? তুমি আজ নিজের জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যার সামনে এসে দাঁড়িয়েছ। তোমার বয়স হয়েছে বুদ্ধি বিবেচনা সবই আছে…তোমার নিজের ওপর তোমার বিশ্বাস যদি থাকে তবে আমার মতামতের ওপর নির্ভর করার কোন প্রয়োজন ত' নেই।

—শুধু এইটুকুই কি আপনার বলবার ছিল?

—হ্যাঁ সোমনাথ!

ফিরে এসেছে সোমনাথ শোভনার কাছে।

একটা কথা বলতে এসেছিলাম শোভনা!

—জানি। যে কথা আপনি বলতে এসেছেন তা আমি ভালো করেই জানি। সেদিন আমার কাছ থেকে জীবনের প্রেরণা সাহস—

অনেক বড় বড় জিনিষ আপনি চেয়েছিলেন, কিন্তু আপনার বাবার মতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তা গ্রহণ করার দুঃসাহস আপনার নেই! এই তো?

স্তম্ভিত হয়ে যায় সোমনাথ। শোভনা যেন আর একটা জগত! সেখানে শুধুই আগুন জ্বলছে। খালি নিজের মশালটা সেই আগুনে ধরিয়ে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া!...

চাপা গলায় চাপ দিয়ে সোমনাথ বলে, আমাকে ভুল বুঝোনা শোভনা!

—এ ভুল বোঝার কথা নয়, ভুল করার কথা। দুর্বল মুহূর্তে উচ্ছ্বাসের মুখে সেদিন যা বলে ফেলেছিলেন সে কথা আজ ফিরিয়ে নিতে পারলে আপনি বেঁচে যান! তবে তার গ্লানিটুকু পাছে নিজের গায়ে লাগে শুধু সেই জন্যেই দ্বিধা! অর্থাৎ কথা আপনি রাখতেই চান কিন্তু প্রত্যাখ্যান করলাম আমি! তাই না?

—কিন্তু তুমি শুধু আমায় আক্রমণই করবে শোভনা, আমার কথাটা শুনবে না?

—কেন শুনবো? কথা ত' আপনি সেদিন অনেক বলেছিলেন, তবে আজ কেন তা আবার ফিরিয়ে নিতে এলেন? যেদিন আপনি এসেছিলেন সেদিন যেমন দরজা খোলা ছিল আজও তেমনি খোলা আছে; নিশ্চিন্ত মনে আপনি চলে যেতে পারেন!

—না। চলে যাব বলে আমি আজ আসিনি। আমি শুধু বলতে এসেছি সুখে-শান্তিতে ঘরকন্না করা আমাদের হবে না, বাধা-বিঘ্ন নিয়েই আমাদের চলতে হবে! পারবে তুমি?

শোভনা হাসলে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বল্লে, আমার দিকে একবার চেয়ে দেখ ত' যারা শুধু সুখে-শান্তিতে ঘরকন্নার স্বপ্ন দেখে...আমাকে দেখে কি তাদেরই মতো মনে হয়?...স্বপ্ন আমিও দেখি, তবে সে শান্তির নয়, সংগ্রামের!

শোভনার হৃদয়ের আগুন কি সোমনাথের মশালে গিয়ে পৌঁছে গেল? শোভনার সেই শান্ত হাসিটুকুর মধ্য দিয়ে!......

সোমনাথ বললে, তাহলে আমিও বলে রাখি, আমারও আর কোন দ্বিধা নেই। আজ আমি কারো আশীর্বাদ চাই না…সহায় চাই না… শুধু তুমি এস…

সবই হল কেবল বিয়ের রাতে শিবনাথের দেখা পাওয়া গেল না উৎসবের মধ্যে!

—সাত—

একি সোমনাথের বিদ্রোহ না সত্যিই সত্যকে মেনে নেওয়া? না সত্যিই ঘুণ ধরা বট গাছে আসবাব বানিয়ে ঘর সাজিয়ে রাখবার পর সেই কাঠের আসবাবে ঘুণ ধরে গেল!

শিবনাথ বসে বসে ভাবেন, এই সেই সোমনাথ। যাকে পুরানো বনেদী হাওয়ার বিষ থেকে বাঁচানোর জন্যে মায়ার হাত ধরে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল একদিন, তারপর কি অমানুষিক পরিশ্রম, কি অসম্ভব প্রত্যাশা নিয়ে জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে সহর বসানো হল।···নতুন পৃথিবীর বোধন হবে যেখানে···নতুন মানুষ···।···মায়ার সেই স্বপ্ন··· সোমনাথ হবে ভাবীকালের প্রথম মহারথ···। সেই সোমনাথ—সাধনের সেবায়, শিবনাথের দরদে আর মনোহরের শিক্ষায় যে বড় হয়ে উঠলো মানুষ হয়ে উঠলো সেই সোমনাথ আজ বিদ্রোহী!

শিবনাথ অবাক হয়ে ভাবেন, কিছু বুঝে উঠতে পারেন না। তারায় তারায় তার উত্তর খোঁজেন। উত্তর নেই সেখানে। শুধু মিনতির জল ছল ছল করছে!

—তবে কি ভুল করলো সোমনাথ? ভুল করে বসলো!···কিন্তু ভুলই বা বলা যায় কি করে? এ যে যুগ যুগ ধরে চৌধুরী বংশের রক্তের ঘুণ। সেই ঘুণ আজ নতুন করে জেগে উঠেছে কেদার সান্যালের স্পর্শ পেয়ে।

ধূলো-বালি দিয়ে কোন-গতিকে চাপা-দেওয়া লোহার টুকরোকে টেনে বের করে নিয়েছে দৈত্যের মত প্রকাণ্ড এক চুম্বক!

এমনই হয়ে থাকে। যে কালো মেঘের টুকরোকে দেখে ভেবেছিলে

জল হবে—যার মুখের দিকে চেয়ে বসেছিলে বহু প্রত্যাশায় সেই মেঘই উপহাসের কালো হাসির মত উড়ে যায় মাথার ওপর দিয়ে ; জল হয় না। যার জন্যে তুমি সর্বস্ব দিচ্ছ, দেখা গেল সে তোমার দিকে ফিরেও তাকাল না। নিজের গন্তব্যের দিকে চলে গেল।

কিন্তু তবু যারা কাজের লোক তাদের কাজ করে যেতে হয়, চাওয়া-পাওয়ার হিসেব না রেখে কাজ করে যেতে হয় নিজের আদর্শকে বজায় রেখে।

এগিয়ে চলেন শিবনাথ!

কেদার সান্যাল যেদিন প্রথম মায়াঘাটে এসে নামলেন সেদিনকার কথা মনে পড়ে? কি সে আগ্রহ? কি সে অমায়িক মূর্তি···আড়ম্বর! মায়াঘাটের মুঠো মুঠো মাটি মাথায় ধারণ করা···শিবনাথের দিকে চেয়ে নমস্কার—সেইজন্য ?···

মনে পড়ে সে সব ?

তারপর ক'বছর কেটে গেছে এখন দেখ, কেদার সান্যালকে চিনতে দেরী হবে। এখন আর ছোট্ট দোকানটি নেই, এখন রীতিমত মায়াঘাট সাপ্লাই কর্পোরেশন। সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য কল-কারখানা ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলেছে তাঁর কোম্পানী। এখনও মুঠো মুঠো করে কুড়োয় কেদার সান্যাল—মাটি নয়—মুঠো মুঠো টাকা—অপরকে বঞ্চিত করা অভিশপ্ত আশীর্বাদ!

চিনতে পারো সেই কেদার সান্যালকে? যে ধীরে ধীরে সাপ-খেলানো বাজীকরের মত বাঁশী বাজিয়ে বাজিয়ে সোমনাথের ভেতরকার সাপগুলোকে জাগিয়ে তুললো চক্ষের আড়ালে! যে সাপ বাসা বেঁধে থাকে পুরনো বটের পচা ডাল আর পাতার বনে আর কোটরে কোটরে?

অথচ, তোমাদের মনে নেই কবে এল সেই ছোট্ট খাট্টো তুচ্ছ মানুষটা—ভূপতি চাটুয্যে! মনে নাই কারও, থাকবার উপায় নেই বলে। কোন আড়ম্বর নেই, ঘোষণা নেই···কিন্তু সে এল···। বর্ষার পর ভিজে নতুন চষা মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখেছো ত? কখন যে সবুজের

প্রথম ছোপ এসে ধরে চট করে ধরা যায় না···বেশ খানিকটা যখন ছেয়ে ফেলে তখন বোঝা যায় যে ধরেছে। এও ঠিক তাই। কবে যে সুরু হল জানা নেই তবে ধীরে ধীরে 'ভারতজ্যোতি'র আন্দোলন যখন ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে তখন সকলের নজরে এল।

এমনি করেই নিঃশব্দে আসে এ ধরণের মানুষগুলো। আবার ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। কিন্তু যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ নিজের বলিষ্ঠ দীপ্তির একটা ছটা ছড়ায় দিগন্ত-জুড়ে, তারপর যখন সরে যায় তার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত কথাটা মনে থাকে,—কি যেন একটা হয়ে গেল!

যে-আগুণ ঘরবাড়ী পুড়িয়ে ছারখার করে দেয় সেই আগুণই আবার অন্যক্ষেত্রে লোহাকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে গন্‌গনে করে তোলে বলেই লোহা বেঁকে। তাছাড়া লোহাকে বাঁকাবার অন্য পথ নেই।

বিয়ের পর শোভনার আগুণের ধর্মটাও যেন এইরকম বাঁক নিয়েছে। বিয়ে হয়ে গেলেও সোমনাথ নিয়ে যায়নি ওকে নিজের বাড়ী। শিবনাথ গ্রহণ করবে কি না সে বিষয়ে ভয় ছিল। কিন্তু তবু শোভনা যেতে চায় সেখানে, যেখানে আজ তার দাবী অস্বীকৃত হয়ে আছে। এই নিয়েই মতবিরোধ, তর্ক!

তারপর সামান্য সামান্য ব্যাপার নিয়েই মনোমালিন্য চলে ওদের মধ্যে। সোমনাথ হয়ত বেড়াতে যাবার জন্যে তৈরী হয়ে এল অথচ শোভনা নির্বিকার হয়ে বসে আছে, কোন সাজ নেই, প্রসাধন নেই!

সোমনাথ বলে, একি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছো যে? এখনও তৈরী হও নি?···

শোভনা তবু নিরুত্তর।

—ব্যাপারটা কি? এই পোষাকেই বেড়াতে যাবে নাকি?

—গেলে খুব দোষ হবে কি? শান্তস্বরে বললে শোভনা।

—না তা নয়···তবে—সোমনাথ শোভনার আরও কাছে এগিয়ে এসে বলে—কিন্তু তোমার কি হয়েছে বল ত?

—হয়নি কিছুই। তবে আজ আর বেড়াতে যাবো না ভাবছি।

—কেন? এর মধ্যেই অরুচি ধরে গেল?...অরুচিটা সান্ধ্যভ্রমণে না আমার সঙ্গতে? বিয়ের পর তবু ছ'টা মাস পার হয় নি এখনও! চোখে-মুখে-বাক্যে বিরক্তির ইঙ্গিত ফুটে ওঠে সোমনাথের!

—হ্যাঁ আমিও তাই বলছিলাম ছ'মাস এখনও পার হয় নি, না? কথা ত নয়, আগুণ যেন! এ আগুণ শক্ত লোহাকে গনগনে করে বেঁকিয়ে দুমড়ে দেবে!

—দেখ শোভনা,—যতদূর সম্ভব নিজেকে সংযত রেখে বলে সোমনাথ —বুদ্ধিটা আমার খুব সূক্ষ্ম নয়, হেঁয়ালি টেঁয়ালি আমি বুঝি না। যা যা বলবার স্পষ্ট করে বল—

—বেশ, স্পষ্ট করেই বলছি তাহলে। ছ'মাস পার হতে না হতেই সব কিছু কি ভুলে গেছ? প্রতিদিন সাজসজ্জা করে দুজনে বেড়িয়ে আসা আর ঘরে ফিরে গল্প করা...আমাদের জীবনে আর কোন আদর্শ কি নেই?...এমনি করেই কি দিন যাবে?

সোমনাথের স্বর একটু যেন নরম হয়ে এল। বললে, মন্দ কি শোভনা...। দিনগুলো যদি চিরকাল এমনি রঙীন থাকে তাহলে আমি অন্ততঃ বিশেষ দুঃখিত হব না...! বলতে বলতে পরম নিশ্চিন্তেই সোমনাথ চেয়ারের মধ্যে গা এলিয়ে দিলে।

—তুমি না হতে পারো কিন্তু আমি হব। শুধু রঙীন দিন কাটানোর চেয়ে অনেক বড় স্বপ্ন...অনেক উঁচু জিনিষ আমি কল্পনা করেছিলাম—

না; শোভনাকে আজ যেন থামানো যাবে না। বহুদিনের নির্বাপিত আগ্নেয়গিরির মত সে যেন জেগে উঠেছে। তাই তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলে উঠলো সোমনাথ,—স্বপ্ন! আমিও ছোটবেলা থেকে বাবার কাছে বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শিখেছিলাম। কিন্তু সেই আকাশ-ছোঁয়া স্বপ্নের চেয়ে এই মাটির পৃথিবীর একটি ছোট ঘর যদি আমার কাছে বেশী সত্য হয়ে থাকে...সেটা এমন কিছু অপরাধ নয়...।

—না। আকাশ যার নাই মাটিও তার কাছে মিথ্যে। একদিন আমি বলেছিলাম...নিশ্চিন্তে ঘর বাঁধবার মেয়ে আমি নই...আমি

এগিয়ে চলার সঙ্গী হতে চাই!···সেদিন তুমিও ত' তাই চেয়েছিলে··· আজ হয়ত সে সব তুমি ভুলে গেছ···ছোট সুখ, ছোট শান্তি আর নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রার মোহে তুমি তা ভুলে গেলেও আমি ভুলি নি··· ভুলতে পারি নি···

শোভনার মাথা উত্তেজনায় অদ্ভুতভাবে দুলছে···কপালের দু'পাশ দিয়ে গুচ্ছ গুচ্ছ চুল ঝুলে পড়েছে ঝুমকোর মত!

ভাল লাগছে সোমনাথের—খুব ভাল লাগছে···। সোমনাথ বলে, তা যদি বল শোভনা আমি ত দেখছি তোমার দিক থেকেই উৎসাহ কমে যাচ্ছে!···তোমাতে আমাতে যখন প্রথম মিল হল সে ত' জলের কলের ব্যাপার নিয়ে···। তুমি উৎসাহ দিলে ভরসা দিলে বলে অতি সহজে আমি আমার বাবার বিরুদ্ধে···আমি যাকে অন্যায় বলে মনে করি তার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারলুম···। তারপর থেকে সেই যুদ্ধ আমাদের চলেছে···আজ বাদে কাল আমাদের শেষ মিটিং··· সে মিটিং-এ একটা হেস্তনেস্ত যা হোক কিছু করতেই হবে···সেজন্যে আমাদের কি অমানুষিক পরিশ্রম করতে হচ্ছে···আমাদের দলে যারা আছে···যারা যারা ভোট দেবে তাদের বাড়ী বাড়ী ঘুরতে হচ্ছে, নাম সংগ্রহ করতে হচ্ছে—লিষ্ট করতে হচ্ছে···অথচ দেখছি তোমার এ ব্যাপারে উৎসাহ যেন কমে আসছে···হ্যাঁ শোভনা ক্রমশই কমে আসছে···অথচ তুমিই আমাকে এ ব্যাপারে নামিয়েছো···

ধীরে ধীরে মাথাটা উঁচু করে শোভনা বলে, না সত্যিই আজ আমার কোন উৎসাহ নেই!

—এ কথা তুমি বলতে পারলে শোভনা? —সোমনাথের বুক থেকে গলা পর্যন্ত ভালোয়-মন্দয় মিশিয়ে অদ্ভুত এক অস্বস্তির মিশ্রণ!—অথচ, তুমিই সেদিন এ ব্যাপার নিয়ে মেতে উঠেছিলে···!

—হ্যাঁ মেতে উঠেছিলাম—দেয়াল-আলমারীটার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে শোভনা বলে, কিন্তু জলের কল একটা উপলক্ষ্য মাত্র, আমাদের আসল যা লক্ষ্য, তার কি ব্যবস্থা করছো বলতে পারো? বলতে পারো

কবে তুমি আমাকে তোমার বাবার কাছে নিয়ে গিয়ে তোমার আমার সব চেয়ে বড় দাবীটাকে সব চেয়ে বড় গলায় স্বীকার করবে ?

আবার আগুন আসছে শোভনার জগতটা থেকে।...

সোমনাথ বলে, এখনও সেই এক কথা ধরে বসে আছো ? কতবার আর বলবো এখন তার কোনও সুবিধে নেই !...

—না থাক তবু আমি সেই কথাই ধরে বসে আছি, ধরে থাকবো ! সুবিধেমত মত আর পথ বদলানো আমার স্বভাব নয়, এইটা এতদিনে আমার বোঝা উচিত !...

—কিন্তু আমিও ত' তোমায় কতবার বুঝিয়ে বলছি যে আপাততঃ বাবার ওখানে গিয়ে ওঠা কিছুতেই আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় !...কেন যে তবু জেদ করে মন খারাপ করছো ?...

—কেন করছি তুমি জানো না ?...

—জানি। আর জানি বলেই ত অবাক হচ্ছি। তুমি বলছো আমাদের ভাবী সন্তান সেখানেই ভূমিষ্ঠ হবে...কিন্তু সে যেখানেই ভূমিষ্ঠ হোক না তাতে কি আসে যায় ?

—আসে যায় বই কি ! তার যে ন্যায্য অধিকার তা থেকে আমরা কেন তাকে বঞ্চিত করবো ?...কেন তাকে আমরা সরিয়ে রাখবো তার নিজের স্বাধীন হাওয়ার প্রথম নিশ্বাস থেকে !...

—কিন্তু বাবা যদি আমাদের আশ্রয় না দেন ?...

—বেশ, তোমার বাবা যদি আমাদের বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে চান,—দেবেন—কিন্তু, সেই ভয়ে সেখানে আমাদের অধিকার আমরা যদি দাবী না করি তাহলে বুঝতে হবে আমাদের এ বিয়ের উপরেই আমাদের বিশ্বাস নেই...এ বিয়েও আমরা অন্যায় বলে মেনে নিয়েছি !...

যুগ বদলে গেছে। পুরো এক যুগ।

এক যুগ আগে, সোমনাথ তখন এতটুকু, মায়া আর শিবনাথের মধ্যে তর্ক উঠেছিল ! মায়া বলেছিল, চল এখান থেকে আমরা চলে যাই। তোমাদের এই পূর্বপুরুষের ভিটে এখানকার বিষের হাওয়া থেকে

সোমনাথকে বাঁচাতে হবে ভাবী কালের নতুন মানুষকে।...কিন্তু শিবনাথ বাধা দিয়েছিল। বলেছিল, না তা হয় না মায়া...এই পিতৃপুরুষের ভিটে...এখানে থেকেই প্রতি পদে পদে লড়াই করে করে নিজের অধিকার আদায় করতে হবে...বাঁচতে হবে।

সেই সোমনাথ...সেই ভাবীকালের মানুষ আজ আর এক ভাবী কালের মানুষের বিষয়ে ভাবছে...।

কিন্তু, কত তফাৎ, কত প্রভেদ, পুব আর পশ্চিম, উত্তর আর দক্ষিণের মত!

তাই বলছি, যুগ বদলেছে। পুরো একটা যুগ।

শেষ পর্যন্ত জলের কল বসালো শিবনাথ মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ থেকেই।

মিউনিসিপ্যাল হলে কেদার সান্যালের দলের গোপনে বৈঠক বসেছে। কেদার সান্যালের দল বলতে, কেদার সান্যাল, হারাধন আর এক জোড়া নতুন আমদানী, করালী আর চৈতন। শান পাথরের মত জোয়ান চেহারা এই দুজনের। শান পাথরের মতই পথে ঘাটে এক পাশে পড়ে থাকে। কুড়িয়ে নিলে কাজে লাগে।... মন্দ লোকে মন্দ কাজে ভিড়িয়ে দেয়—মাথা ফাটায় জিনিষ ভাঙ্গে আর ভাল লোকের হাতে যদি পড়ে ত কোন শুভ কাজেও লেগে যেতে পারে আশ্চর্য নেই।... এমনি শান পাথরের মতই এ মানুষ দুটোর স্বভাব। করালী আর চৈতন!

চুপি চুপি আলোচনা চলছে ওদের। ফিস-ফাস্ ফিস-ফাস্...। মনে হচ্ছে শুভবুদ্ধির ফসলের গোড়ায় গোড়ায় চুপি চুপি চোরের মত বাঁকা ষড়যন্ত্রের কাস্তে চলছে...ঘস্ ঘস্...। ঘন ঘন।...

কেদার সান্যাল বলছিলেন, সব ব্যবস্থা ঠিক আছে ত?

করালী বলে, আজ্ঞে বেঠিক হবার যো কই? কি বল চৈতন?

—কিন্তু, ভারতজ্যোতি যা পিছনে লেগেছে আমাদের!...খুব হুঁসিয়ার!

—কেন? ভারতজ্যোতি আবার কি লিখলো?...

—লিখতে আর বাকি রেখেছে কি? স্পষ্টই লিখেছে যে মিউনিসি-

প্যালিটির কলে কেন জল উঠছে না তা নাকি একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে!

হারাধন বলে, আজ্ঞে তা ত' যাবেই যথার্থ!···

কেদার সান্যাল দাঁতে দাঁত চেপে গর্জে ওঠেন, তুমি থামো!··· আরও কি লিখছে জানো?···লিখছে যে মূলে কে বা কাহারা আছে বুঝ সাধু যে জানো সন্ধান! কতবড় শয়তান দেখেছো?···

—একবার হুকুম দিলে আজ্ঞে মেরে পাট তক্তা করে দিই। কি বল চৈতন?···

—বল্লেই ত হয়···। চৈতন সমর্থন করে করালীকে।

—না না না ওসব শান্তিভঙ্গে কাজ নেই তাতে গণ্ডগোল আরও বাড়বে। কিন্তু আমি ভাবছি ভারতজ্যোতি এসব কথা লেখে কোন সাহসে? তোমরা যে তলায় তলায় এসব বিগড়ে দিচ্ছ কিছু খবর না রাখলে···

—আজ্ঞে আমাদের কাছে অমন কাঁচা কাজ পাবেন না—কি বল চৈতন!

চৈতন বলে—হুঁঃ।

—সে ত জানি···তা না হলে আর তোমাদের লাগিয়েছি। কেদার সান্যালের দোকতাচটিত সবগুলো দাঁত বেরিয়ে পড়ে দল বেঁধে।··· তা কাজ কতটা হয়েছে বল দেখি?

—আজ্ঞে সে প্রায় সবই হয়ে গেছে···খালি দক্ষিণ পাড়ার কলখানা বাকি···কি বল চৈতন?

—তাহলে বুঝেছো ত' আজই রাত্তিরের মধ্যে ওগুলো বিগড়ে দেওয়া চাই···! তারপর আমি দেখে নিচ্ছি।

হারাধন বলে, আজ্ঞে যথার্থ ওদের কল আর আপনার কৌশল!

—থামো তুমি! গর্জে ওঠেন কেদার সান্যাল। তারপর গম্ভীর হয়ে বলেন করালী আর চৈতনের দিকে চেয়ে,···খুব হুঁসিয়ার কিন্তু! কেউ যেন কোন সন্দেহ না করে! ভারতজ্যোতি বোধ হয় চর লাগিয়েছে।···

হঠাৎ ঘরের এক কোণে হুড়মুড় করে একখানা চেয়ার পড়ে গেল। চমকে উঠলো কেদার সান্যালের দল!

—কে? কে ওখানে?

—ভারতজ্যোতির চর নয় ত!

—বোধ হয় তাই!

—দেখ না চৈতন!

ঘরের সেই কোণ থেকে একটা লোক উঠে বসে হাই তুলতে তুলতে। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, ছেঁড়া-ময়লা বেশ···ভদ্রলোকের মত দেখতে হলেও পাগলাটে—পাগলাটে চেহারা···। চোখের ভাবটা কেমন যেন ভাবহীন। ঠিক যেদিকে যেদিকে দেখবার মত কিছুই নেই ঠিক সেইদিকে সেইদিকে একদৃষ্টিতে হাঁ করে চেয়ে থাকে!

—কে হে এখানে? কেদার সান্যাল গর্জন করে ওঠেন!

করালী বলে, কে হে তুমি? কোত্থেকে এসেছো?

—এখানে কি মতলব? চৈতন চোখ পাকিয়ে এগিয়ে যায়!

হারাধনও চেঁচায়—এর মধ্যে ঢুকলে কি করে?···

লোকটা এতক্ষণে তাকায় ওদের দিকে। বলে, আস্তে···আস্তে ভাই আস্তে!···একে ত' কাঁচা ঘুমটা দিলে ভাঙ্গিয়ে···তার ওপর সবাই মিলে অমন কোরাসে জেরা করলে মাথা গুলিয়ে যাবে যে!

কেদার সান্যাল এগিয়ে আসেন ওর দিকে। বলেন, আচ্ছা আমি একাই জিগ্যেস করছি···কে তুমি বল দেখি!···

—পরিচয়টা দিতেই হবে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ দিতে হবে···। কেদার সান্যাল হুমকি দিয়ে ওঠেন!···

—বেশ শুনুন তাহলে। ভট্টনারায়নের সন্তান, কাশ্যপ গোত্র··· স্বভাব-নৈকষ্য কুলীন ফুলেল মেল···ভবঘুরে ব্রাহ্মণ!···

—ওসব পরিচয় কে চেয়েছে তোমার কাছে?···

—বাপ-পিতামোর নামগুলো উচ্চারণ করে তাঁদের আর লজ্জা দিতে চাই না।···

—আচ্ছা জ্বালাতন !…তুমি…থাকো কোথায় ?

…কেন ? ঘরে !

—ঘরে ! কোন ঘরে ?…

—আজ্ঞে বড় ঘরে !…

—বড় ঘরে !…মানে—

—আজ্ঞে হ্যাঁ বড় ঘরেই !…খুব বড় ঘরে !…

—খুবই বড় ঘরে ! অর্থাৎ—

—আজ্ঞে হ্যাঁ, পৃথিবী !

—পৃথিবী ?…

—হ্যাঁ বললাম যে ভবঘুরের লোক ! বলেই লোকটা ফিক ফিক করে হাসে।

—হুঁ তা কর কি ?

—আজ্ঞে ব্যবসা !

—ব্যবসা ! ব্যবসা কিসের ?…

—বাজে কথার ! বিনা মূলধনে আর কিসের ব্যবসা চলে বলুন ?

—বটে ! খুব কথা জানো দেখছি ! এখানে এসে ঢুকেছিলে কি উদ্দেশ্যে ?…

—দেখতেই ত পেলেন স্যর, নতুন লোক, কোথাও আস্তানা না পেয়ে নিরিবিলিতে এখানে একটু ঘুমোতে এসেছিলাম। আপনাদের অনুগ্রহ সেটুকুও হল কই ?…

—হুঁ। …একটু কি যেন ভেবে নিলেন কেদারবাবু। তারপর বললেন, ভারতজ্যোতির সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে ?…

—ভারতজ্যোতি ! বিস্ময়ে লোকটার চোখদুটো কপালে উঠে গেল। বললে, ভারতের জ্যোতি আর কোথায় যে সম্পর্ক থাকবে। ভারত ত' অন্ধকার !…

করালী বলে চুপি চুপি, লোক সুবিধের নয় আজ্ঞে ! বড় ত্যাড়া-ব্যাঁকা কথা কইছে।

—চলে এস চলে এস…কোথাকার ভবঘুরে—এসে জুটেছে এইখানে

—মিছে সময় নষ্ট করে লাভ নেই এর পেছনে···এস আমাদের অনেক কাজ বাকি আছে এখনও—

হন হন করে কেদার সান্যাল এগিয়ে গেলেন বাইরের দিকে, এবং তাঁর পেছন পেছন গেল তাঁর দলটি।

এদিকে লোকটা চেঁচাতে লাগলো, রাগ করলেন স্যর? ও স্যর! ও স্যর! ও মশায় শুনছেন! এখানে ধর্মশালা কোথায় আছে বলতে পারেন?···কি হল! ভয় পেয়ে গেল নাকি! এঁ্যা?···

এবং সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠলো হো-হো করে।

বাড়ী ফিরে এসে কেদার সান্যাল দেখলেন মস্ত বড় একটা কল বিগড়ে গেছে। শোভনা নেই।

শোভনা নেই। স্তম্ভিত হয়ে গেলেন কেদার সান্যাল। কিছুদিন ধরে সোমনাথের সঙ্গে একটু আধটু মনোমালিন্য চলছিল বটে কিন্তু তাই বলে—। ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারলেন না তিনি। কতবার তিনি বলেছেন বুঝিয়ে সোমনাথকে, যে শোভনা বড় অভিমানী মেয়ে একটু না সহ্য করে চললে···।

শোভনাকে না পাওয়া গেলেও শোভনার হাতের একখানা চিঠি পাওয়া গেল সোমনাথকে লেখা। চিঠি পড়ে সোমনাথ যা আন্দাজ করছিল তাই পেলে। সোমনাথ পড়ে শোনালে কেদারবাবুকে শোভনা যা লিখেছে। ছোট্ট অনাড়ম্বর চিঠি। শুধু দরকারী কথাগুলো পর-পর সাজানো, পাহাড়ের ভেতরকার পর-পর স্তরের মত।

'আমার ভাবী সন্তানের মুখ চেয়ে আমাদের যা ন্যায্য অধিকার তা' আমি নিজেই দাবী করতে চললুম। কবে তোমার সে সৎসাহস হবে, সে আশায় বসে থাকতে পারলাম না। ইচ্ছে হলে তুমি সেখানে গিয়ে আমার পাশে দাঁড়াতে পার।'

সৎসাহস! ঐ খণ্ড ত'য়ের মত চিড় খেয়ে উঠলো সোমনাথের ভেতরটা। ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে ঠাণ্ডা আকাশের নীচে এসে দাঁড়াল। তারার চুমকি বসানো আকাশ বিশাল এক ভালোবাসার মত বিস্তৃত হয়ে আছে।···

অসংখ্য তারার মাঝে সোমনাথ জবাব খুঁজলো। কিন্তু কোন সমাধানের ভাষা নেই সেখানে, কেবল দেখা গেল কয়েকটা তারার মধ্য থেকে কয়েক টুকরো উল্কা ছিটকে বেরিয়ে এসে দ্রুতগতিতে শূন্যের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল !···

মনের আকাশখানার ওপর শোভনার অক্ষরগুলো তারার মত জ্বলছে। কোনোটা ছোট, কোনোটা আবার বড়।···'আমার ভাবী সন্তানের মুখ চেয়ে আমাদের যা ন্যায্য অধিকার তা' আমি নিজেই দাবী করতে চললুম !"···দাবী জানাতে চলেছে শোভনা ! কার দাবী ? কিসের দাবী ? যার জন্যে দাবী করতে গেল তার ওপরও দাবী আছে সোমনাথের···শুধু তাকে বহন করবার ক্লেশ সহ্য করছে বলে সে দাবী শোভনার একলার নয়···!···তবে ?··

মানুষের জন্মগত অধিকারের কতটুকু মূল্য, কতটুকু তার প্রভাব ? সে অধিকার নিয়ে জড়িয়ে থাকলে এই মায়াঘাট এই ভাবীকালের বিরাট পটভূমিকা কোথা থেকে আসতো ?···উল্কাগুলো শূন্যের অনিশ্চয়তার মাঝে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে যেতো কেন ?···

আচ্ছা মনে পড়ে সোমনাথের চৌধুরী বাড়ীতে সেই সত্যনারায়ণের সিন্নীর রাত ! সে রাতে কেমন বাজনা বেজে উঠেছিল অবিনাশ কাকাদের দিকটায়।

অথচ শিবনাথ এমন মুখ করে বসেছিল খাটের ওপরটায় যে অতবড় বাজনাটাকে ভুলে আড়ষ্ট হয়ে বসেছিল সোমনাথ !···এমন কি মায়া শুদ্ধ একটা কথা কইতে পারে নি।··· তারপর কতদিন বাবার কোলের কাছে শুয়ে শুয়ে সোমনাথের সে ছবি মনে এসেছে আর প্রত্যেকদিনই নতুন করে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে এসেছে হাত-পা-বুক !

তারপর থেকে সব আকাশের শূন্যের মতই অপরিষ্কার ! ভাল মনে নেই। জঙ্গল···লড়াই···মায়াঘাট !···

তারপর যেখান থেকে স্পষ্ট মনে পড়ে সে হল কেদার সান্যাল··· কি ব্যক্তিত্ব···প্রখর ব্যবসায় বুদ্ধি···আর সবাইকে টেক্কা দিয়ে দাবীয়ে রেখে বড় হবার জন্যে লড়াই। শুধু মুগ্ধ হবার পালা। তারপর

শোভনার বহ্নি স্পর্শ! দোলায়িত মাথায় গুচ্ছ গুচ্ছ চুলের ঝুমকো···। গোধুলির আলোর রাঙ্গা অথচ স্নিগ্ধ পরশ···।

তবু, তবু আর একটা জোর ছিল···এখনও সে জোরটা ক্রিয়া করে চলেছে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে···। সে হল শিবনাথের জ্বলন্ত ব্যক্তিত্ব···যে ভাবীকালের স্বপ্নে এই মায়াঘাটের উৎপত্তি সেই ভাবীকালের প্রথম মানুষের ওপর অলক্ষ্য হলেও অচ্ছেদ্য এক দাবী!

কিন্তু শোভনা? শোভনা কি সত্যি সত্যিই ভুল করে বসলো? ওর মত মেয়ে হয়ে এত বড় ভুল?

ভুল ভেঙ্গে গেল শোভনার! রূঢ় প্রত্যাখ্যান পাবার জন্যেই তৈরী হয়ে গিয়েছিল সে অন্তরে অন্তরে। তাই যতটা ভয় ছিল মনে, ঠিক ততটা কঠিন ভাবে দাবীটা জানিয়ে বসলো শিবনাথের সামনে। দারুণ উত্তেজিত হয়ে থাকলেও মাথা তখন তার আর দুলছে না। স্থির হয়ে আনত হয়ে আছে মাটির দিকে, যার দাবী সে জানাতে এসেছে।

—আমি জানতে এসেছি পুত্রবধূ বলে আমাকে স্বীকার করতে আপনার আপত্তি আছে কি না? জানতে এসেছি এ বাড়ীতে আমার ন্যায্য অধিকারের জায়গা আছে কি নেই?

শিবনাথ কাজে ব্যস্ত ছিলেন টেবিলের ওপর মুখ রেখে। শোভনার জোরালো স্বর শুনে ওর দিকে ফিরে তাকালেন একবার। উঁচু হিমালয় যেমন করে তাকিয়ে থাকে উর্বর নীচু মাটির দিকে।

—কেন থাকবে না মা? কবে তুমি এসে নিজের জায়গা দখল করে নেবে, তারই জন্যে ত' অপেক্ষা করছিলাম!

—অপেক্ষা করছিলেন! আমাকে তা হলে ফিরিয়ে দেবেন না?

অত উঁচু হিমালয় থেকে নীচু মাটিকে বড় বেশী সবুজ দেখাচ্ছে যেন!

—ফিরিয়ে দিলেই তুমি ফিরে যাবে কেন মা? ন্যায্য অধিকার—দাবী কি অমন ভয়ে ভয়ে আদায় করতে হয়!···এস মা, এস—

শোভনা যে কি পেয়েছে শিবনাথের মধ্যে জানা নেই তবে শিবনাথ পেয়েছেন অনেক কিছু। পেয়েছেন চৌধুরী বংশের শেষ বংশধর—

সোমনাথের প্রথম পুত্র ইন্দ্রনাথকে। ইন্দ্রনাথকে মানুষ করবার ভার পেয়েছেন শিবনাথ। শোভনাও শিবনাথের কাছে ইন্দ্রনাথকে তুলে ধরতে পেরে নিশ্চিন্ত। শুধু নিশ্চিন্তই নয় কেদার সান্যাল যখন ইন্দ্রনাথের মুখ দেখতে এলেন তখন শোভনা বাবাকে বলেছে, আশীর্বাদ কর বাবা আমার ছেলে যেন তার ঠাকুর্দার মতোই হয়!···

মনে মনে যাই থাক মুখে যতটা সম্ভব অম্লান হাসি হেসে কেদারবাবু বলেছেন, নিশ্চয়···নিশ্চয়···হবেই ত! আমি না বললেও হবে!

সেই শোভনা—যে একদিন কেদার সান্যাল আর সোমনাথকে প্রেরণা দিয়েছিল শিবনাথের একাধিপত্যের বিরুদ্ধে নিজেদের স্বাতন্ত্র্যকে জাগিয়ে তুলতে, তার জন্যে লড়াই করতে।···সেই শোভনাই আজ দেখো শিবনাথের প্রধান সহায়ক হয়ে তার পাশে পাশে রয়েছে। শিবনাথের বিশাল ব্যক্তিত্বের পাশে অযথা নিজের ক্ষুদ্রতাকে নিয়ে জাহিরী করার ধৃষ্টতা ত্যাগ করেছে একেবারে। শিবনাথকে সময়গত প্রেরণা দিচ্ছে, সাহায্য করছে সে···।

—এতটুকু একটা মানুষ কিন্তু সোমনাথ তাকে দেখে শেষ করে উঠতে পারে না। নিত্য নতুন করে চিনতে হয় শোভনাকে। সোমনাথ বলে, আশ্চর্য শোভনা, অদ্ভুত তোমার পরিবর্তন!

—পরিবর্তন! শান্তভাবে অবাক হয় শোভনা। পরিবর্তন তুমি দেখলে কোথায়?···

—পরিবর্তন নয়! মনে পড়ে তুমি একদিন বলেছিলে যে তোমাদের মধ্যে এমন একটা লোক নেই যে বাবার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস করে—

শোভনা তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, ভুল কোরো না আমায়। আমি তোমাদের দাঁড়াতে বলেছিলুম কোন ব্যক্তিগত মানুষের বিরুদ্ধে ত নয়। আমি তোমাদের সামান্যতম প্রেরণাও যদি দিয়ে থাকি সে ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে, কোন মানুষের বিরুদ্ধে ত নয়!

—তুমি কি বলতে চাও আজ আমরা আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ছি না? আমরা—

—ঠিক তাই! শোভনার স্বর কঠিন রকমের শান্ত!

—ঠিক তাই?

—হ্যাঁ ঠিক তাই! তোমার বাবাকে আজ যে প্যাঁচে ফেলতে চাইছো তোমাদের মায়াঘাট সাপ্লাই কর্পোরেশন—

—আঃ কি যা তা বলছো শোভনা···

—না না যা তা নয়···যা তা নয় আমায় বলতে দাও তুমি···বলতে দাও···

শোভনার মাথা দুলছে···দুলছে দুপাশের গুচ্ছ গুচ্ছ চুল···। শোভনা বলে চলেছে, তোমাদের শেষ চক্রান্তের কথা আমি সব শুনেছি···তোমরা এঁকে অপমান করতে চাও···তোমরা প্রমাণ করতে চাও তোমার বাবা মায়াঘাটের প্রথম প্রতিষ্ঠার সময় ঋণ করে যে খাল কাটিয়েছিলেন সে ঋণের দায়িত্ব শুধু তাঁর, সেই ঋণের টাকা তোমরা অস্বীকার করবে···সে ঋণে মায়াঘাটের কোন দায়িত্ব নেই···সে ঋণ তোমার বাবার ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্যে করা হয়েছিল···

—থামো শোভনা থামো। আমায় বুঝিয়ে বলতে দাও—। তোমার বোঝার ভুল আছে অনেক—

—কোন ভুল নেই আমার, মিথ্যে প্রবোধ দিতে চেয়ো না আমায়··· আমি নিজে তোমার বাবা আর আমার বাবার মধ্যে কথাবার্তা বলতে শুনেছি···

—শোভনা! সোমনাথ ব্যর্থ—নিষ্ফলতায় চেঁচিয়ে ওঠে।

—রাগ কোরো না তুমি। কিন্তু একটা কথা আমায় বুঝিয়ে বলবে? ···বুঝিয়ে বলবে কেন তোমরা এমন করছো?

—কিন্তু সত্যিই সে ঋণ যে অন্যায় শোভনা!···একজনের ভুলের জন্যে সমস্ত মায়াঘাট তার ভার বহন করতে যাবে কেন?

—বেশ আমি না হয় স্বীকার করছি সেটা তাঁর ভুল···কিন্তু তারও পরে আমি বলবো যে একজনের ভুল সমস্ত মায়াঘাট শুধু এইজন্যেই বহন করবে ঠিক যেই জন্যে একজনের চেষ্টার শুভফল ভোগ করছে সমস্ত মায়াঘাট!

—আসলে ভুল হয়েছিল সোমনাথের। সে ভুল করে ভেবেছিল শোভনার আগেকার সমস্ত আগুন বুঝি নিভে জল হয়ে গেছে। জল হয়ে গেছে হয়ত সত্যিই, কিন্তু শুধু জল ত' এ নয়, এ হল জলের বন্যা—যার বিরুদ্ধে বুক পেতে দাঁড়ানো আগুনের সঙ্গে লড়াই করার চেয়ে একটুও কম শক্ত নয়!

খানিকক্ষণ গুম্ হয়ে থেকে সোমনাথ বলে, বেশ। তুমি তাহলে বলতে চাও আমি যা করছি তা অন্যায়?···

—অন্যায় কি ন্যায় তা জানি না তবে এটুকু বলতে পারি আগামী মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের মিটিংএ যখন এই প্রস্তাবটা তুলে ওঁকে ওরা অপদস্থ করতে চেষ্টা করবে তখন তোমার উচিৎ বাবার পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে সমর্থন করা—বল তুমি আমার এ অনুরোধ রাখবে?···

—কেন বারবার অন্যায় অনুরোধ করছো আমায় শোভনা?···বিপদ যদি সত্যিই আসে তাহলে বাবার একলাই তা সামলাবার ক্ষমতা আছে! তা ছাড়া—

—তা ছাড়া!

—তা ছাড়া আমারও একটা স্বাধীন মতামত আছে। জেনে শুনে আমিই বা নিজের বিরুদ্ধে যাবো কেন?

—বেশ। তাহলে তোমায় বলে রাখি যে তুমি যে কাজ করতে পারো না তোমার হয়ে আমাকে সে কাজ করতে হবে! আমি বাবার সঙ্গে সভায় যাবো।

কথাটা শেষ করে শোভনা আর দাঁড়ালো না। বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে!

মিউনিসিপ্যাল হলে মিটিং বসেছে। মিটিংএ সেই গুরুতর বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবার কথা। সেই খাল-কাটার ঋণ সমস্ত মায়াঘাট মেনে নেবে কি না!

কথাটা এর আগে কেদার সান্যাল শিবনাথের কাছে পেড়ে দেখেছিলেন। কিন্তু শিবনাথ বেশ শক্ত হয়েই জবাব দিয়েছিল,

তা ত হয় না কেদারবাবু! ঋণ যখন করা হয়েছে তখন শোধ দিতেই হবে।·;·

কেদার সান্যাল একটু বাঁকা-পথেই বোঝাতে চেষ্টা করেছেন শিবনাথকে। বলেছেন, এতখানি উদারতার প্রয়োজন কি বলতে পারেন শিবনাথবাবু? দেশে আইন আছে, তারি প্যাঁচে যদি সে ঋণ অস্বীকার করা যায়—

—আইনের প্যাঁচে লোকের চোখে ধুলো দেওয়া যায়, কিন্তু যা সত্য তা মিথ্যা হয়ে যায় না।··· শিবনাথের কথা জলের মত সোজা।

—কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটি ত' পাঁচশো ভূতের কারবার, তার আবার সত্য-মিথ্যা পাপ-পুণ্যের দায় আছে নাকি?···

—নিশ্চয় আছে। একের বেলা যে নীতি মানি, সহস্রের বেলা তার বদল হবে কেন? আপনার কাছে ঋণ করে আমি যদি শোধ দিতে বাধ্য হই তাহলে মিউনিসিপ্যালিটির বেলাতেই বা তা হবে না কেন?··· এই আমার শেষ কথা কেদারবাবু। আপনাদের ওই জুয়াচুরিতে আমার কোন সায় নেই!

রাগে জ্বলে ওঠেন কেদার সান্যাল সোজাসুজি এই ইঙ্গিতটা শুনে। বলেন, বটে! জুয়াচুরি! কিন্তু আজ যদি বলি, আপনারা নিজেদের স্বার্থের জন্যে টাকা ধার নিয়ে সে ঋণ মায়াঘাটের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন তখন কোথায় থাকে আপনার ওই যীশুখৃষ্টের নীতি?

যীশুখৃষ্টের নীতি যে কোথায় থাকে ইতিহাস যুগে যুগে তার সাক্ষ্য দিয়ে আসছে। তাই শিবনাথ কোন জবাব দেন নি। নীরব হয়ে গেছেন। রাগে গরগর করতে করতে উঠে গেছেন কেদার সান্যাল। ইন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে শিবনাথের সঙ্গে যেটুকু প্রীতিবন্ধনের চেষ্টা চলেছিল তার শেষ আশাটুকুও মুছে গেছে তার সঙ্গে।

তাই, কেদার সান্যালের দল তৈরী হয়ে এসেছে সভায়। যে করে হোক কেদার সান্যালকে আজ জিততে হবে। নামিয়ে দিতে হবে শিবনাথকে।

কেদার সান্যালের দল তৈরী হয়ে বসে আছে, শিবনাথের অপেক্ষায়। নিজেদের মধ্যে আলোচনা চলছে, পরামর্শ হচ্ছে।

শিবনাথের আসতে একটু দেরী হয়ে গেল। আসবার আগে শোভনা বলেছিল যে সে সঙ্গে যাবে। শোভনাকে শান্ত করতে সময় লেগেছে খানিকটা! শেষটা শিবনাথ বলেছেন, ওরা যদি আমায় সত্যিই অপমান করে তাতে ভয় কি মা।···তাই বলে তুমি কেন কষ্ট করে যাবে ওদের মাঝখানে। ওদের সম্মান এতদিন যেমন করে নিয়েছি, অপমানও তেমনি ভাবে গ্রহণ করবো···।···

তাই শোভনা আসেনি শিবনাথের সঙ্গে। একাই এসেছে শিবনাথ। আর ওদিকে কেদার সান্যালের পক্ষে সোমনাথও অনুপস্থিত রয়ে গেছে শেষ পর্যন্ত!···

সভা আরম্ভ হতেই কেদার সান্যাল কথাটা পেড়ে বসলেন সকলের সামনে। সকলের দিকে, বিশেষ করে নিজের দলের দিকে ভাল করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে সান্যাল মশাই সুরু করলেন, উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ, আজকে আপনাদের সামনে একটি সমস্যার উত্থাপন করতে চাই। সমস্যাটা জটিল নয়, তবে আপনাদের ভেবে দেখা দরকার আপনাদের আজ কর্তব্য কি? বিনা দ্বিধায় আপনারা আজ আপনাদের নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করবেন।··· আমি আপনাদের একটা প্রশ্ন করতে চাই—গত বাইশ বছর ধরে খালকাটার নামে যে প্রকাণ্ড ঋণের অঙ্ক মায়াঘাট মিউনিসিপ্যালিটি বহন করে আসছে, সেই গুরুভার ঋণের জন্য দায়ী কে? এর কোনও সদুত্তর কেউ দিতে পারেন? বলতে পারেন কেউ এত বড় ঋণের বোঝা কেন মায়াঘাটের ওপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে আছে?···

—নিশ্চয় পারি! অনুচ্চ অথচ কঠিন স্বরে কথাটা উচ্চারণ করে উঠে দাঁড়ালেন শিবনাথ সকলের মাঝখানে।···নিশ্চয় পারি। সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্য যে ঋণ করা হয়েছিল তার জন্যে সর্বসাধারণই দায়ী!

—সুন্দর কথা! অল্প হেসে মাথা দুলিয়ে বললেন কেদার সান্যাল। কিন্তু, সর্বসাধারণের কল্যাণটা কি রকম?···

জনতার মধ্য থেকে কে যেন বলে উঠলো, অনেকটা রঙিন ফানুষের মত! শুধু গরম কথার ধোঁয়ায় ভরা, বস্তু কিছুই নেই!···

জনতার মধ্যে হাসির রোল !

মনোহর : অর্ডার অর্ডার…!…

কেদার সান্যাল আবার বলেন, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি যে বাইশ বছর আগে মায়াঘাটে যখন মিউনিসিপ্যালিটি ছিল না তখন যে খাল কাটা হয়েছিল তার ঋণের জন্যে আজকের মিউনিসিপ্যালিটি দায়ী হবে কেন ?…

জবাব দিলেন শিবনাথ। দায়ী হবে এই জন্যে যে, আজ বাইশ বছর ধরে ওই খালের সুবিধা জনসাধারণ ভোগ করে আসছে। ওই খাল কাটা না হলে সেদিনের মায়াঘাট আজকের মায়াঘাট হত না ! এমনকি আমাদের মাননীয় বক্তাও আজ এই সভায় দাড়িয়ে প্রশ্ন করার সুযোগ পেতেন না !

হারাধন পেছন থেকে বলে, আঁজ্ঞে যথার্থ। খাল কাটা না হলে কুমীর আসতো কি করে বলুন ?…

—আঃ থামো তুমি—কিন্তু… কেদার সান্যাল একটুও অপ্রতিভ না হয়ে বলতে লাগলেন, সেদিন খাল কাটা বাবদ যে টাকাটা সংগ্রহ হয়েছিল…সেটা খরচ হয়েছিল আপনারই মর্জি অনুসারে। তার দায় মিউনিসিপ্যালিটি বইবে কেন ? আপনারাই বলুন এ কোন দেশী নীতি ?…

জনতা : হ্যাঁ, এ কোন দেশী নীতি ?…

শিবনাথ বলেন, এ সর্বদেশের সর্বকালের নীতি। এ মনুষ্যত্বের নীতি। ঋণের টাকা শোধ করে দেওয়া হবে সেদিন এই প্রতিশ্রুতিই আমরা দিয়েছিলাম !

—আমরা নয় আপনি ! আর ঋণের কথাই যদি বলেন, আইনের বিচারে সে-ঋণের দাবী টেঁকে না।…

জনতা : ঠিক ঠিক টেঁকে না।…

মনোহর : অসম্ভব ! মিথ্যে কথা !…

শিবনাথ বলে, শুনুন আপনারা, আইনের বিচারের চেয়েও বড় বিচার আছে, সে-বিচার ফাঁকি দেওয়া যায় না। খাল কাটার সময়

মায়াঘাট মিউনিসিপ্যালিটিকে যারা ঋণ দিয়েছিল তারা আইন জানতো না। তারা কেউ লাঙ্গল বেচে কেউ স্ত্রীর গয়না বেচে কেউ পৈত্রিক ভিটে বন্ধক দিয়ে টাকা এনে দিয়েছিল। নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে তারা শুধু এই জানতো যে সে-টাকা একদিন তারা ফিরে পাবেই। মিউনিসি-প্যালিটির ঋণ সেই বিশ্বাসের ঋণ!

জনৈক কণ্ঠ: ওসব বড় বড় কথা আমরা শুনতে চাই না।

২য় কণ্ঠ: সেদিনের সেই টাকা আপনার কাছেই গচ্ছিত ছিল, তার হিসেব-নিকেশ আপনিই করবেন!...

স্তম্ভিত হয়ে যায় শিবনাথ। বিস্মিত স্বরে বলে, এ আপনারা কি বলছেন?...

—ঠিকই বলছি, ও ঋণ আমরা মানি না!...

জনতা: না মানি না। ঋণ আমরা মানি না।...

মনোহর জনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করে কিন্তু তারা তখন সমস্ত সংযুক্তির বাইরে চলে গেছে।

এমন সময়ে বাইরে থেকে ছুটে এল একটা লোক। পাগলের মত চেহারা। চোখে দৃষ্টির আগুন জ্বলছে।...কেদার সান্যাল স্তম্ভিত হয়ে দেখেন এই সেই ভবঘুরে লোকটা যাকে সেদিন মিউনিসিপ্যাল হলে হঠাৎ পাওয়া গিয়েছিল চেয়ারের আড়ালে।

লোকটি ছুটে এসেই চীৎকার করে বলতে সুরু করলে, চুপ করুন সবাই। বাইরে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ আপনাদের এই চমৎকার প্রহসন দেখছিলাম। যাঁর অনুগ্রহে মায়াঘাটের জন্ম, যাঁর দয়ায় আপনারা এক একজন কেউকেটা হয়ে মিটিংএ দাঁড়িয়ে গলাবাজী করছেন আজ স্বার্থের খাতিরে তাঁকে অপমান করতে লজ্জা হয় না? নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকের দল!

কেদার সান্যাল ধমকে ওঠেন, এই চোপরও। তারপর সকলের দিকে ফিরে বলেন, শুনুন সকলে, আজকের সভায় যাদের ভোট দেওয়ার অধিকার নেই মায়াঘাটের বাইরে থেকে যারা দালালী করতে এসেছে তাদের এখান থেকে বের করে দেওয়া হোক।

লোকটা কিন্তু একটুও বিচলিত হয় না। বলে, থামুন! কাকে হুমকি দিচ্ছেন! সত্যি কথা বলতে সুরেশ্বর ভয় পায় না··· বুঝলেন?···

মনোহর চেঁচিয়ে ওঠে: নিশ্চয়। যা সত্যি তা একশোবার বলবে।

সভার মধ্যে গোলমাল। হৈ-চৈ।

শিবনাথ এগিয়ে আসেন মনোহর আর সুরেশ্বরের দিকে। বলেন, থাক ভাই আর প্রতিবাদ করো না। জীবনে চুপ করবার সময়ও আসে···। আজ মনে হচ্ছে সব ভুল···হয়ত আমার বিশ্বাসও ভুল!

গণ্ডগোলের মাঝে গলা উঁচিয়ে কেদার সান্যাল ঘোষণা করে দেন, তা হলে সর্বসম্মতিক্রমে এই সভা শিবনাথবাবুর কাল্পনিক অথবা ব্যক্তিগত ঋণ যা তিনি সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্যে মায়াঘাট মিউনিসিপ্যালিটির স্কন্ধে চাপাতে চেয়েছিলেন, সেই ঋণ অগ্রাহ্য করলো!

জনতা: হ্যাঁ অগ্রাহ্য করলো। শেম! শেম!

সত্যই ব্যাপারটা বিশ্বাস করা শক্ত। সেই শিবনাথ, যিনি সমস্ত জীবন দিয়ে মায়াঘাটের বীজ পুঁতে গেলেন মায়ার শুভস্বপ্নের মাটিতে, সেই বীজ থেকে জন্ম নিলে মায়াঘাট। ···তারপর···ফলে ফুলে রসে-গন্ধে ভরে গেল। কত ভিন দেশের পাখী এসে বাসা বাঁধলো তার ডালে ডালে। কত প্রজাপতি এসে উড়ে বেড়াতে লাগলো তার ফুলকে ঘিরে ঘিরে। ···কত মৌমাছি ছুটে এল মধুর গন্ধ পেয়ে।

তেমনি আবার তার কোটরে বাসা বাঁধলো সাপ। সাপের বংশ। তারা একদিন ছোবল মারতে লাগলো ফোঁস ফোঁস করে···। বিষের ছোবল।···

বিশ্বাস কি করা যায় যে শিবনাথই একদিন মায়াঘাটের বুকের ওপর দাঁড়িয়েই প্রমাণিত হলেন জোচ্চোর বলে! তিনিই নাকি প্রতারিত করেছেন সমস্ত মায়াঘাটকে নিজের স্বার্থের জন্যে!···

বিশ্বাস করতে পারা যায়? রাম যেদিন রাজা হবেন ঠিক সেইদিনই তাঁকে সর্বস্ব ছেড়ে যেতে হল বনে, চৌদ্দ বছরের মত!

শেম্—শেম্···

হল থেকে জনতার চীৎকার তখনও শোনা যাচ্ছে। বিরাট বিরাট ঢেউ যেন সাগর পারে আছড়ে আছড়ে পড়ছে। আছড়ে পড়ছে সাগরের বুকে মাথাতোলা পাহাড়-কে ঘিরে। শুধু কাণে নয়, শিবনাথের হাতে-বুকে, চোখে-মুখে-মাথায় আছড়ে আছড়ে পড়ছে!

শিবনাথের মনে কি পড়ছে সেদিনকার রাতের সেই সত্যনারায়ণের সিন্নীর কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজ! হাতুড়ি-পেটার আর্তনাদ!

না, মনে পড়ছে না শিবনাথের। সেদিনকার পরাজয়ের গ্লানিটাই আঘাত দিয়েছিল বেশী কিন্তু আজকে পরাজয়কে হেলায় জয় করে শিবনাথ হয়েছেন গ্লানিহর!

কালভৈরব কালবৈশাখীর ঝঞ্ঝাবৃষ্টি যখন চলে, তখন আকাশটা কি কাঁদে, না দানবের মত মেঘগুলোই কেঁদে কেঁদে ঝরে ঝরে পড়ে?···

তবু, শিবনাথ ঠিক করেছেন চলে যাবেন মায়াঘাট ছেড়ে। যেমন করে একদিন চৌধুরী বংশের ভিটে ছেড়ে যাত্রা করেছিলেন···জেল খানার ঢেউ খেলানো পাঁচিল পেরিয়ে···কালাপানীর কালো জল পেরিয়ে যেখানে নতুন জীবন ডাক দিচ্ছে সেই দিক পানে···। এ যাত্রা ঠিক তেমন নয়। কারণ এ যাওয়া ঠিক যাত্রা নয়, এর নাম মহাপ্রস্থান!

শিবনাথের সঙ্গে যাবে সাধন, যাবে মনোহর। শিবনাথের ঘরে ওরা এসে সব জড় হয়েছে। আর এসেছে সুরেশ্বর। সাধন সব জিনিষপত্র গোছাচ্ছে। কোনটা নেবে, কোনটা নেবে না সাধন নিজের বুদ্ধি দিয়েই সব বিবেচনা করে নির্বাচন করছে।···

শোভনা এসে দাঁড়ালো ঘরের মধ্যে। ওর চেহারা অবর্ণনীয়। ফুল-পাতা-হীন শীতের দিনের গাছের মত রিক্ত-সর্বস্ব অসম্ভব রকমের ব্যাকুল, শীর্ণ, কম্পমান!

একবার শুধু বললে, আপনি তাহলে সত্যিই চললেন বাবা?

জবাবটা দিলে সাধন। বললে, যাবে না? এ দেশে মানুষ থাকতে পারে? বলতে পার মা কী অপরাধ আমাদের? কী দোষ করেছে দেবতা? জঙ্গলের সঙ্গে লড়াই করে বুকের রক্ত দিয়ে যে মায়াঘাটকে

গড়ে তুললো সেই মায়াঘাট আজ এমনি করে—যত সব বেইমানের দল! ...টুটিগুলো ধরে—

শিবনাথ বাধা দেন। বলেন, আঃ সাধন! চুপ কর!

—আর চুপ করে থাকতে পারছি না দেবতা! তার চেয়ে বল নিজের টুটি নিজে টিপে ধরি। কিন্তু এখনো চন্দ্র-সূর্য উঠছে, এতখানি অন্যায় ধর্মে সইবে না···বুঝবে বুঝবে···লক্ষ্মীছাড়ার দল একদিন বুঝবে!···

ভবঘুরে সুরেশ্বর এক কোণে বসে বসে সাধনের কথা শুনছিল। এবারে জবাব দিলে। বললে, কাদের ওপর রাগ করছো সাধন? ওই লক্ষ্মীছাড়ার দলই তোমার ভাই। ওরাই যে আমাদের দেশ! ওদের নিয়েই ওদের মধ্যেই ত বাঁচতে হবে, তোমাকে আমাকে···সবাইকে।

মনোহর মাষ্টার বল্লে, এতদিন তাইই ত বিশ্বাস করে এলুম সুরেশ্বর। মন প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করলুম এরাই আমাদের সব···কত আশা ছিল এরা মানুষ হবে···এদের সঙ্গে মানুষের মত বাঁচবো···শুধু তাই নয়, শিবনাথবাবু দেখালেন শুধু বাঁচলেই চলবে না···বাঁচাতে হবে··· বাঁচাতে হবে তাদেরকে যাদের বাঁচবার সবগুলো পথই রুদ্ধ। ···কিন্তু তার এই ফল?

—ঠিকই ত হয়েছে মনোহরবাবু। ···অনেক ঘুরলুম এই বয়েসে—অনেক মানুষের সঙ্গে মিশলুম···আর তারই ফলে এটা বুঝতে পেরেছি যে মায়াঘাটের পরিণাম দুনিয়ায় যা হয়ে থাকে তাই—হয়েছে। এতে দুঃখ করবার কিছু নেই···।

ঘরের ভেতর খানিকটা স্তব্ধতা গম্ গম্ করতে লাগলো।

খানিকক্ষণ পরে শোভনা বললে, কিছুতেই কি আপনার থাকা চলে না বাবা?···

—না মা। যেখান থেকে আমার আদর্শ, আমার সত্য আগেই বিদায় নিয়েছে, সেখানে ত' আমার আর থাকা চলে না!···

—কিন্তু মায়াঘাটকে তাহলে কে দেখবে বাবা?

—তোমরা ত রইলে মা। আর রইলো সুরেশ্বর। শোন সুরেশ,

তোমার সঙ্গে ভাল করে পরিচয় হল না—তবু একটা কথা বলি, একদিন যে কাজ সুরু করেছিলাম···সে কাজ তোমাকেই হয়ত শেষ করতে হবে বন্ধু। তুমিই সে ভার নাও আজ থেকে।···

—এই ত মুস্কিলে ফেললেন! সুরেশ বলে, আমি ভবঘুরে মানুষ··· চালচুলো নেই···

—ভবঘুরেকেই ত সবচেয়ে দরকার সুরেশ। শিবনাথ বাধা দিয়ে বলেন, তোমার পাওয়ার লোভও নেই, হারাবার ভয়ও নেই···তাই তোমাকে দিয়েই হবে। তোমাকে দিয়েই হবে সুরেশ্বর।

তাহলে পাথেয়টা দিয়ে যেতে হবে আপনাকে···আপনার আশীর্বাদ!

শোভনাও এগিয়ে আসে। বলে, যাবার আগে মায়াঘাটকে আপনি ক্ষমা করে যান বাবা!

—ক্ষমার কথা ওঠে না মা। যাওয়ার আগে বরং আমিই তোমাকে বলি, তুমি কল্যাণী···তুমি ভাবীকালের জননী···অতীত যদি পাপ করে থাকে, বর্তমান যদি অপরাধ করে তবে সেই পাপ, সেই ক্রটি তুমিই ক্ষমা করে নিও···চল সাধন···চল মাষ্টার আমাদের এবার যেতে হবে··· ইন্দ্রনাথকে আমার আশীর্বাদ দিও মা—

হঠাৎ শোভনা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সকলে ভাবলে কান্নার জলকে রোধ করার এটা একটা ব্যর্থ প্রচেষ্টা মাত্র।

কিন্তু তা নয়।

পাশের ঘরে ঘুমিয়ে ছিল ইন্দ্রনাথ। সোমনাথও বসে ছিল ঘরের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে। শোভনা সেই ঘরে এসে ঢুকলো। কোলে তুলে নিলে ইন্দ্রনাথকে। তারপর হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

ইন্দ্রনাথকে কোলে নিয়ে শোভনা এসে দাঁড়ালো শিবনাথের সামনে।

—একে আপনি গ্রহণ করুন বাবা!

ফুল-হীন অঞ্জলিবদ্ধ করপুট ভরে উথলে উঠেছে নৈবেদ্যে। ফলে ফুলে ভরে উঠেছে শীতের দিনের বিশীর্ণ রিক্ত গাছ আকাশের নীচে।···

—সে কি মা? আকাশের বুকে বিদ্যুতের জিজ্ঞাসা! চমকে ওঠেন শিবনাথ!

—হ্যাঁ বাবা। আমার ইন্দ্রনাথকে আপনি গ্রহণ করুন···সমস্ত মায়াঘাটের পাপ থেকে···অভিশাপ থেকে একে বাঁচান···একে মানুষ করে তুলুন··· ।

শিবনাথের অতবড় বিস্ময় এক ফুঁয়ে নিভে গেল যেন। বললেন, দাও মা !

কেন নিভে গেল সে বিস্ময় ! শোভনার কণ্ঠে শিবনাথ কোন অতীত স্বর শুনছে কি ? মায়ার আকুল মিনতি ?

সন্ধ্যে তখন ঘনিয়ে এসেছে রাত্রির প্রথম পর্বে ! দরজার ফাঁকা গলি দিয়ে আকাশের যতটুকু দেখা যাচ্ছে ততখানি ভর্তি তারার অসংখ্য ফুলঝুরি !

শিবনাথ শোভনার চোখে চোখে আকাশের সেই তারাদের সঙ্গে কথা বলছেন !···

তাই, শুধু একটি ধ্রুবতারা নয়, অতগুলো আকাশ-ভরা তারাকে সাক্ষী রেখে শিবনাথ বেরিয়ে পড়লেন ইন্দ্রনাথকে নিয়ে।

—আট—

দেশলাইয়ের বারুদ-মাখানো গায়ে বারুদের কাঠি ঠুকে আগুণ জ্বলে। সেই ফুস্ করে জ্বলে ওঠা এতটুকু আগুণ থেকে মস্ত একটা অগ্নিকাণ্ডও হয়ে যেতে পারে। তা সে বড়ই হোক আর ছোটই হোক আগুণটা জ্বলে উঠলে আগুণের লাল আকর্ষণের দিকেই নজর পড়ে লোকের। খোঁজ করে না দেশলাইটার।

তেমনি, ইন্দ্রনাথ যখন মায়াঘাটে ফিরলো তখন তাকে দেখালো ঠিক ঐ দেশলাই থেকে ঠিক্‌রানো আগুণটার মত। তার পেছনের দেশলাইটার খোঁজ করলে না কেউ। চিনতে পারলে না ওকে সোমনাথের ছেলে বলে।

আগুণের ধর্ম ই তাই, সে গ্রাস করে সবাইকে, ধরে সবাইকে, কেবল আগুণকে ধরতে পারে না কেউ। ইন্দ্রনাথ মানুষটা এই জাতেরই। বয়েস তার শুধু আগুণ নয় আগুণ নিয়েও খেলা করবার মত। আগুণ নিয়ে খেলে বই কি সে!···যারা দেশের মধ্যে সব চেয়ে বঞ্চিত, সবচেয়ে অবহেলিত তাদের নিয়ে ও লড়াই করে যাদের সব আছে, সব চেয়ে বেশী করে আছে, আর সবাইকে বঞ্চিত করে যাদের সব হচ্ছে, তাদের সঙ্গে। আগুণ নিয়ে খেলা নয় ত কি?

ইন্দ্রনাথের দল ভগবানের সব চেয়ে আদিতম সৃষ্টি যে আকাশ, সেই আকাশের নীচে দাঁড়ায়, পৃথিবীর অকৃপন দান এই মাটির ওপর। এই দুটো অবিরল আশীর্বাদে কি সঞ্জীবনী আছে জানা নেই, তবু দেখি এই সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে মানুষগুলো নিজেদের দাবী জানাবার শক্তি পায়। আর কিছু না হোক—বাতাস—খোলা বাতাস ওদের সমস্ত বুক

ভরে দিয়ে ওদের চীৎকারে সাহায্য করে···। তারপর ওদের দাবী নিশ্বাসের হাওয়ার সঙ্গে ঝড়ের মত বেরোয়। আর গ্রীষ্মের দুপুরে পশ্চিমের রিক্ত মাঠের হাওয়াকে সূর্য যেমন করে তাতায় তেমনি করে ওদের সেই ঝড়ের হাওয়ার আগুণ ধরায় ইন্দ্রনাথ—জমাট আগুণের মত মানুষটা!

নিবিড় জঙ্গলের ঝড়-ঝঞ্ঝা-বৃষ্টির ভয়াবহতার চেয়ে রিক্ত মরুভূমির বুকের এই বিষাক্ত নিশ্বাস—এই শুকনো-গরম ঝড় কিছু কম?

মায়াঘাট আর সে মায়াঘাট নেই। সে-যুগের দৃষ্টি নিয়ে এ-যুগের দেশের দিকে তাকালে চিনতে কষ্ট হবে। অবশ্য ইন্দ্রনাথের পক্ষে এ সবের কোন মূল্য নেই। প্রকৃতপক্ষে এই যুবকবয়সে এই এখনকার মায়াঘাটের পরিচয়ই তার পরিচয়। এই মায়াঘাটের মাটিতেই যে তার জন্ম সে কথা তার মনে নেই। না বলে দিলে সে বিশ্বাসও করবে না।

শিবনাথ যখন মায়াঘাট ছেড়ে গিয়েছিলেন তখনকার চেয়ে এখন হয়ত মায়াঘাটের সমৃদ্ধি আরও বেড়েছে। আরও লোকজন, আরও কল-কারখানা, ব্যবসা, বাণিজ্য, মানুষকে কৃত্রিম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মোহ দেখিয়ে নিত্যনতুন শোষণ করার ফন্দী। মায়াঘাট সাপ্লাই কর্পোরেশন এখন আরও তার আধিপত্য বিছিয়ে বসেছে। হাজার হাজার নতুন মানুষ আমদানী হয়েছে, বাসা বেঁধেছে ওখানে। মায়াঘাট সাপ্লাই কর্পোরেশনের কলের চাকা ঘোরাবার জন্যে জুটে গেছে তারা। দুমুঠো অন্নের সংস্থান হচ্ছে তাদের, সমস্ত শক্তি আর মনুষ্যত্ব নিংড়ে। তবু মায়াঘাটের সমৃদ্ধি বাড়ছে বই কি? সহরের মধ্যে যাদের বাড়ীগুলো আজ প্রাসাদের মত, যাদের চেহারা, চাকচিক্য সবচেয়ে জমকালো, ব্যাঙ্কের খাতার মোটা অঙ্কের জোরে যাদের নাম আজ সবার আগে, তাদের চোখে দেখলে মায়াঘাট আগের চেয়ে কত বড় হয়ে গেছে, কত বেশী সভ্য, উন্নততর।···এদের ডিঙ্গিয়ে ওদের পেছনে যারা আছে তাদের দিকে তোমার নজর পড়বে না। পড়বার নিয়ম নেই বলে। শিবনাথের যুগের সেই গাছের নীচে মাটির ওপর পাঠশালা, ছোট

ছোট কুটির, মাটির মানুষের সঙ্গে একসাথে দাঁড়িয়ে কোদাল দিয়ে মাটি কোপানো, খাল-কাটা···এ সবের কোন জৌলুস নেই আজ! থাকবে কি করে?

চোত-বোশেখের দামোদরের চেহারা দেখেছো কখনও? কেমন রুগ্ন, শীর্ণ, একহারা···। বর্ষার দিনের উচ্ছ্বাস নেই, ব্যাকুলতা নেই, প্রগলভতা নেই,···আছে শুধু আদি ও অকৃত্রিম পথ খুঁজে নিয়ে চলার প্রবৃত্তিটুকু। পাছে উচ্ছ্বাসের দিনে পথ খুঁজে না পাওয়া যায়· তাই এই স্মৃতিটুকু বয়ে নিয়ে যাওয়া মাত্র। ···এপাশে ওপাশে বর্ষার পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে। অল্প অল্প ভাঙ্গনের দাগ···এদিকে ওদিকে সবুজ উর্বরতা। কিন্তু তবু দামোদর শুধু শীর্ণ, জীর্ণ, পঙ্গু।···

শোভনাকে এই চোত-বোশেখের দামোদরের মত দেখায়। কে বলবে এ সেই আগের দিনের শোভনা। জীবনকে প্রবাহের মধ্য দিয়ে উড়িয়ে কাঁপিয়ে নিয়ে যাবার অদম্য একটা আগ্রহ ছিল যার। সমস্ত অন্যায় আর দূষিত বিবেকের বিরুদ্ধে নিজের শুভবুদ্ধি দিয়ে রুখে দাঁড়াতে যে একলা এগিয়ে যেতো···। এ সেই শোভনাই, সেই সব অতীত দিনের ধ্বংসাবশেষের মত বেঁচে আছে। কপালের দুপাশের সেই দু'গুচ্ছ চুল···যারা ঝুলে পড়তো উত্তেজনার মুহূর্তে, ঝুলে পড়ে দুলতো··· আর সোমনাথ মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দেখতো চুলের সেই ঝুমকোলতা; সেই চুলে আজ পাক ধরেছে শীতের দিনের পাণ্ডুর ঝুমকোলতার বিশীর্ণ ডালপালার মত তাদের দেখায় প্রাণহীন। ···দামোদরের আশেপাশে বর্ষা-দিনের ভাঙ্গনের অনুর্বর সাদা সাদা পদচিহ্ন···।···

তবু বেঁচে আছে শোভনা। আছে সোমনাথের সঙ্গে। দুজনেই দুজনকে নিয়ে বেঁচে আছে যাদের একদিন স্বপ্ন ছিল জীবনকে তারা বহন করবে শান্তির মধ্য দিয়ে নয়—সংগ্রামের মধ্য দিয়ে—এরা তারাই। আজও এরা স্বপ্ন দেখে—সে স্বপ্ন ভবিষ্যতের নয়, সে স্বপ্ন স্বপ্নের মত অতীতের! যে অতীতের গর্ভে ওদের ভবিষ্যতের সমাধি হয়ে গেছে বহুদিন।

দেখে মনে হয় কি চোত-বোশেখের দামোদরকে যে এর আবার

ভাদ্র-আশ্বিন আসবে। ফেঁপে ফুলে এই শীর্ণ দেহই আবার সকল বাধা দীর্ণ করে উচ্ছ্বসিত প্রগল্‌ভতায় বাণ ছোটাবে? অতীতের স্মৃতিগর্ভে জন্ম নেবে ভবিষ্যতের প্রাণ? দেখে মনে হয় কি?

দেখে মনে কিছু না হলেও, শোভনা মনে মনে দেখে ইন্দ্রনাথ ফিরে আসবে একদিন। নতুন যুগের নতুন প্রাণ-পাওয়া মানুষ···। সেই অতীতকালের সবুজ স্বপ্নে প্রাণ-পাওয়া, চেতনা-পাওয়া ইন্দ্রনাথ। মায়াঘাটের দূষিত আবহাওয়ার বাইরে শিবনাথের কাছে যে মানুষ হচ্ছে। সত্যিকারের মানুষ!

পরধনশিকারী কেদার সান্যালদের দলের স্বার্থ-অন্বেষণ ঠিক চলেছে। যত ধন সঞ্চিত হচ্ছে তত বাড়ছে—আহরণ নয়—ধন হরণ করার স্পৃহা। যান্ত্রিক সভ্যতার শোষণের যন্ত্র কাঁটায় কাঁটায় চলছে। সুরু হয়েছে এই শোষণ পর্বের সর্বশেষ আর সর্বতম করুণ অধ্যায়! এ অধ্যায়ের ঘড়ির কাঁটার মতই কাজ চলে। খুব মহৎ কিছু একটা উদ্দেশ্য না থাকলেও খুব নীচ যে কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে তাও নয়। কিন্তু তবু অপরকে বঞ্চিত করে—লক্ষ লক্ষ সাধারণকে শুষে নিয়ে একজনের বা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের অসাধারণ হবার এই নিরন্তর প্রবৃত্তি ওদের মনের সেই দূষিত ক্ষুধাকে ক্রমাগত ইন্ধন জোগায়। সেইখানেই ওদের আনন্দ। ঘড়ির কাঁটা দুটোর কোন উদ্দেশ্য নেই, কোথায় গিয়ে পৌছবে এমন কোন লক্ষ্য স্থির নেই তবু একবার দম পেলেই পর পর সংখ্যাগুলোকে কাঁটায় কাঁটায় খোঁচা মেরে চলছে ত চলছেই।···

সোমনাথের জড়তা এসে গেছে। নিজের মধ্যেই বিরাট একটা শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে গেছে সে নিজে। ক্ষয়রোগের রোগীকে দেখেছো কখনও? যদি দেখে থাকো তাহলে বুঝবে ক্ষয়রোগে প্রথম অবস্থায় কেমন একটা অস্থির চঞ্চলতা, কেমন একটা কর্মস্পৃহা আনচান করে রক্তে। খুব খানিকটা উদ্যম, প্রাণশক্তি···তারপর ধীরে ধীরে ক্ষয়··· মৃত্যু। ···একদিন বংশের পুরাণো রক্ত কোলাহল তুলেছিল সোমনাথের রক্তে। যার জ্বালায় যার জোরে সবরকম বন্ধন তুচ্ছ করে সংগ্রাম করতে করতে ছিটকে বেরিয়ে এল সোমনাথ বংশের বাইরের নতুন শিক্ষার

নতুন আবহাওয়ার সুস্থতা থেকে···আজ আবার সেই পুরাণো ঘুণ একেবারে নির্জীব করে ফেলেছে তাকে। এক মৃত্যু আর এক মৃত্যুকে ইন্ধন জোগাচ্ছে। দম দেওয়া ঘড়ির কাঁটার মত চলছে সে উদ্দেশ্য হীন পথে নিরন্তর খোঁচা দিতে দিতে।···

ইন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে বই কি! কিন্তু তবু তার ওপর একটা যে তার অধিকার আছে সেটা যেন ঠিকমত অনুভব করতে পারে না সোমনাথ। সেই যে তার ভূমিষ্ঠ হবার আগে থেকেই শোভনার সঙ্গে গণ্ডগোল স্থরু হল,···একান্ত নিজের জিদের ওপর জোর দিয়েই শোভনা বাড়ী ছেড়ে চলে এসে উঠলো শিবনাথের কাছে তখন থেকেই সোমনাথের হৃদয়ে কোথায় যেন এমন একটা হোঁচট লেগেছে যে তার জন্যে আজও সে সমস্ত মনটাকে সুস্থ সবলের মত সোজা হয়ে চালাতে পারছে না। ···তারপর শোভনাও বদলে যেতে লাগলো। সে সংগ্রামিকার রূপ তার নিভে গেল সোমনাথের চোখে। শিবনাথের বিরাট ব্যক্তিত্বের হিমালয়ের নীচে ধীর শান্ত সবুজ সমতলের মত বিছিয়ে গেল শোভনা। সেই সমতল শান্ত মাটির নীচে সোমনাথের বিদ্রোহী মনের শেষ চঞ্চলতার কি সমাধি হয়ে গেছে বহুদিন? ঘুমিয়ে গেছে চিরদিনের মত?

জেগে আছে একজন। শুধু জেগে নেই, দেখছি, চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে, সে সুরেশ, ভারতজ্যোতির নতুন কর্মী। তার ভবঘুরে মন আজ শৃঙ্খলিত। কিন্তু এ শৃঙ্খল জড়তার শৃঙ্খল নয়। এ যেন বাঁধ দিয়ে ধরে রাখা বন্যার জল—যে জল শুষ্ক অনুর্বর ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে সঞ্চারিত হয়ে সজীব করে তুলছে সবুজ ফসলের গুচ্ছকে! এ শৃঙ্খল আর এক দিকের সঞ্চারিত মুক্তি!

আজকের দিনে ভারতজ্যোতির কাজও বেড়েছে অনেক। বঞ্চিতের সংখ্যা যত বাড়ছে দিন দিন তত বাড়ছে তার দায়িত্ব। তবে সেই সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে গেছে তার শক্তি। পুকুরের জলে টুপ করে ছিপ ফেললে যেমন ছড়িয়ে ছড়িয়ে বেড়ে যায় বৃত্তাকার ঢেউ, তেমনি করে বেড়ে চলেছে তার পরিধি। ঢেউ বিস্তার করছে জলে জলে, শেষটা হয়ত কানায় ঠেকে উপছে উঠবে।

ভূপতি বেশ বুড়ো হয়ে গেছে। মনের তেজটা আগের মত টগবগে থাকলেও দেহটা ঠিকমত, খুশীমত বয় না। তাই কাজের চাপটা সব সময় সইতে পারে না বলে সুরেশ্বরের ওপর গিয়ে পড়েছে। সুরেশ্বর আজ বুড়োর হাতের লাঠির মত! সুরেশ্বর ছাড়া সম্পাদকের কাজ করছে আর একজন, নাম তার কানাই! দোষে-গুণে মানুষ! মাঝে মাঝে একটু নেশা-টেশা করার বদভ্যেস আছে। তাই কলম যখন ধরে তখন যে কথাটা বলবার নেশার ঝোঁকের মতই খুব ঝোঁক দিয়ে বলে, জোর দিয়ে বলে···। আরও আছে অনেক, নরেশ ভট্টাচার্য্য··· ইত্যাদি ছোট ছোট মানুষ নীচু হয়ে বাঁচলেও সমাজের ওপরওয়ালাদের মত নীচ নয় যারা···এই ধরণের সব মানুষ!

আছে শান্তি। ভূপতির নাতনী। বয়সটা নেহাৎ কাঁচা ষোলো-সতেরো। একে মেয়ে তায় আবার বয়সে নেহাৎ ছেলেমানুষ তাই সহজে বিশেষ আমল দেয় না কেউ। তাই কাজ করার সুবিধে ওর খুব। যে কাজটা পায় তাতে আন্তরিকতার বন্যা দিয়ে চুবিয়ে দেয়। এমনি ধরণের মেয়ে সে।

ছোট্ট এতটুকু প্রেসের ঘর। ঘর ত নয় যেন বিরাট এক আগ্নেয়-গিরির গর্ভ। ঐ যে খোপে খোপে টুকরো টুকরো লোহার অক্ষরের স্তূপ—ছোট ছোট ত্যাড়া ব্যাঁকা লোহার টুকরো এ ওর ঘাড়ে কোনরকমে কুঁকড়ে এতটুকু খোপের মধ্যে সব ঘুমিয়ে আছে ঐ ছোট ছোট টুকরোগুলোকে একসঙ্গে সাজাও, তারপর ছাপো, দেখবে সত্যি কি লোহার মত জোর ওদের। কি না করতে পারে ওরা? কি না বলতে পারে? ঐ অক্ষরগুলো! চাই কি আগুনের মত ছিটিয়ে যেতে পারে তোমার, আমার, দশ, বিশ, দুশো, পাঁচশো, হাজার, লক্ষ লোকের ওপর দিয়ে।···আর, ঐ একই ঘরে বসে যে মানুষগুলো ঐ অক্ষরগুলোকে এক এক করে সাজায়, বসায়, ছাপে তাদের কথাও তাহলে একবার ভাবো। বাইরে থেকে বোঝা যায় না, চাল নেই চুলো নেই, চাকচিক্য নেই ভড়ং নেই, অথচ কি না করতে পারে ওরা? কি না করছে?

সুরেশ্বর বলে, এই মায়াঘাটে যে সংগ্রাম আমরা সুরু করেছি, দিন

দিন তা' কঠিনতর হয়ে উঠছে। আমাদের বিপক্ষদল শুধু শক্তিশালী নয়, তারা কৌশলী, ধূর্ত,—তাদের অর্থবল ও লোকবল দুইই আছে। আমরা জানি, আমাদের অর্থ নেই, সহায় নেই, লোকবল নেই তবু এ সংগ্রাম আমাদের চালিয়ে যেতে হবে—যতদিন না সত্য, ন্যায় আর আদর্শের জয় হয়, যতদিন না এই মায়াঘাটে মানুষ মানুষের পূর্ণ অধিকার পায়···। আমাদের কিছু না থাকলেও এই সংগ্রামের জন্য চরম অস্ত্র আমাদের হাতে আছে। সে হচ্ছে এই প্রেস—এই ভারতজ্যোতি কাগজ। আজকের যুগে সংবাদপত্রের মতো এত বড় বাহন আর নেই। একদিকে এ যেমন জাতীয় জীবনে নিদারুণ অকল্যাণ ডেকে আনতে পারে, অন্যদিকে তেমনি মিথ্যা, পাপ, অন্যায়ের আবর্জনা দূর করে সত্য, ন্যায়, কল্যাণের প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এই চরম অস্ত্র দিয়েই আমাদের লড়াই করতে হবে—।

ঠিক! বলে ওঠে ভূপতি। ভারতজ্যোতি শুধু একটা সংবাদপত্র নয়, এ হচ্ছে মশাল। এই মশালের আলোয় তোমরা মায়াঘাটের জনসাধারণকে পথ চিনিয়ে দাও—

ঘন অন্ধকারে নিরেট কালোর মাঝে যখন মশাল জ্বলে তখন কেমন লাল-লাল আর কালো-কালো একটা ছবি ভেসে ওঠে। অদ্ভুত সেই লাল-কালোর মিশ্রণ! আর সেইখানেই বিশেষত্ব মশালের। মশালের লাল-লাল শিখা কালো-কালো অন্ধকারে হিলহিলিয়ে ওঠে আর সমস্ত চারদিক ভরে কেমন লাল আর কালো দপ্‌দপ্‌ করতে থাকে।

এই কালো দিকটা ছায়া ফেলছে কেদার সান্যালের মনে, কেদার সান্যালের দলের মনে। ভারতজ্যোতির আন্দোলনের জের ভীতিময় দুঃস্বপ্নের ছায়ার মত কাঁপছে ওদের চতুর্দিকে। আর আসলে ঐ কোণঠাসা নড়বড়ে ভারতজ্যোতিকে যত বেশী ভয় করে কেদার সান্যালের দল তত বেশী সংগ্রাম করে ওর সঙ্গে। এ সংগ্রাম ভয়কে দূর করবার সংগ্রাম, জয় করবার নয়। আর এটা ভাল করে ওদের জানা আছে বলেই প্রতি পদে ওদের মনে পড়ে যায় ভারতজ্যোতির অস্তিত্বকে।

বিশেষ করে এই সব কথা আলোচনা হচ্ছিল কেদার সান্যালের

ঘরে কিছুদিন ধরে। শিবনাথ থাকতে থাকতেই মিউনিসিপ্যালিটির খাল-কাটার দরুণ বিরাট সেই ঋণ কেদার সান্যালের দল জোর করে অস্বীকার করেছে আর সেইজন্যে মায়াঘাটের জন্মদাতা শিবনাথকে চলে যেতে হয়েছে মায়াঘাট ছেড়ে। কিন্তু তবু শিবনাথের দলের যারা ছিল তাদের এখনও বাগানো যাচ্ছে না। অতবড় অন্যায়টা সহ্য করতে বাধ্য হলেও এখনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে তারা লড়ে, ভারতজ্যোতির দল তাদের প্রেরণা দেয়, উৎসাহ দেয়, সাহায্য করে। অথচ এদের জব্দ করে, আর ভারতজ্যোতিকে স্তব্ধ করে মিউনিসিপ্যালিটিটাকে নিজেদের হাতের মুঠোর মধ্যে আনতে না পারলে চলবে না। স্বার্থসিদ্ধ হবে না কেদার সান্যালের।

—যে করে হোক মিউনিসিপ্যালিটিটা আমাদের হাত করা চাই তা না হলে কোন শান্তি নেই। কোন লাভ নেই এত পরিশ্রম করে। আজকের ঘরোয়া বৈঠকে এই কথাটাই জোর দিয়ে বলছিলেন কেদার সান্যাল! আমরা দেখছি মায়াঘাটের সমস্ত জমির ওপর দখল রয়েছে মিউনিসিপ্যালিটির···সুতরাং আমাদের মিউনিসিপ্যালিটির ওপর জোর না থাকলে ঐ সব জমি আমরা কিছুই কাজে লাগাতে পারবো না।

—কিন্তু আর জমি নিয়ে কি হবে আমাদের? সোমনাথ যেন একটু অতিষ্ঠের মতই প্রশ্নটা তোলে।

—কি হবে? আশ্চর্য, সোমনাথ দিন দিন তুমি যে কি হয়ে যাচ্ছো। ···উৎসাহ নেই, উদ্যম নেই···আরে আমি যা বলছি···মুখে রক্ত উঠে যে খাটছি সে ত' তোমার মানে তোমাদের ভালোর জন্যেই···এঁ্যা? এই যে আমাদের মায়াঘাট সাপ্লাই কর্পোরেশন আজ এত বড় হয়ে উঠেছে···এতগুলো কারখানা এতগুলো মিল···এতগুলো লোক করে খাচ্ছে তার দৌলতে সে সব কি আমার ব্যক্তিগত সুখের জন্যে না এই লক্ষ লক্ষ গরীব কিষাণ-মজুরদের মুখ চেয়ে···বল তোমরা বল···

—হিয়ার···হিয়ার···যথার্থ···। রব ওঠে আশপাশ থেকে।

—তারপর আরও যে সমস্ত আমাদের প্ল্যান আছে আরও নতুন

নতুন কারখানা বসাবার মতলব যা আমরা করেছি তা করতে গেলে আরও জমি দরকার আমাদের···

—নিশ্চয়ই দরকার। সমর্থন আসে আশপাশ থেকে।

—কিন্তু কোথায় জমি? বলে সোমনাথ।

—আছে, জমি আছে। অল্প একটু হেসে ঘাড় নামিয়ে বলেন সান্যাল মশায়। একটু ভেবে দেখলেই আমরা দেখতে পাবো, নিতে পারলে আরও কত জমি পড়ে আছে আমাদের সামনে। ···এই ধর মিউনিসিপ্যালিটির হাতে যে অতগুলো পার্ক আছে···কি প্রয়োজন আছে ঐ সব জমিগুলোকে অনর্থক ফেলে রাখা? বল···

—কিন্তু জনস্বাস্থ্য,—কে যেন বলতে চেষ্টা করে—

—ঠিক কথা জনস্বাস্থ্য, সে আমিও বুঝি···কিন্তু ভেবে দেখ···ভেবে দেখ তোমরা জনস্বাস্থ্যের নামে কতগুলো লোকের বাজে আড্ডা দেবার জায়গার বদলে কয়েক হাজার লোকের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা যদি আমরা করতে পারি কারখানা বসিয়ে, তাহলে কোনটার মূল্য বেশী বলে মনে হয় তোমাদের? বল?

—কারখানা! কারখানা চাই!

—দাঁড়াও। আরও ভাববার দিক আছে। একটু থেমে কেদার সান্যাল সকলের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নেন একবার, পিটিয়ে খেলার আগে ভাল ব্যাটস্‌ম্যান যেমন করে দেখে নেয় ফিল্ডিং সাজানো। ···তারপর বলতে আরম্ভ করেন, দেখ আমাদের মায়াঘাটের পূবদিকে যে কুলি বস্তিটা আছে···আমরা সব খোঁজ-খবর নিয়ে দেখেছি যে, বস্তিটা যত প্রকাণ্ড সেই অনুপাতে ওখানে লোক থাকে কম···আমার মনে হয় ঐ লোকগুলোকে ওখান থেকে উঠিয়ে অন্য জায়গায় সরিয়ে দিতে পারলে ঐ জমিটা আমরা কাজে লাগাতে পারি—

—কিন্তু ওরা যাবে কোথায়? সোমনাথ প্রশ্ন করে।

—কোথাও একটা জায়গা করে নেবে। তাছাড়া ওখানকার বস্তির মালিকের সঙ্গে আমি কথা কয়ে দেখেছি যে, প্রত্যেক ব্যাটার পাঁচ ছ'মাস করে ঘর ভাড়া বাকী পড়ে আছে। ঐরকম করলে ভদ্রলোকের চলে

কি করে বল ? এমনিই ত ওদের তাড়াতে পারলে উনি বাঁচেন তার ওপর এমন একটা মহৎ কাজে—জনসাধারণের তথা মায়াঘাটের সমৃদ্ধির জন্যে কল্যাণের জন্যে বিরাট কারখানা বসবে—

—কিন্তু ভারতজ্যোতির কথাটা একবার ভেবে দেখেছেন ? এই সব নিয়ে ভারতজ্যোতি যদি আন্দোলন চালায়···যদি শেষটা একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে বসে ? সেটা ভেবে দেখেছেন কি ?

—মিথ্যে তোমার ভয় সোমনাথ ! আমরা ত অন্যায় কিছু করি নি ! আর তবু যদি ভারতজ্যোতি গোলমাল করতে চায়, তাহলে তার ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। তাই বলে কয়েকটা মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থের জন্যে সমস্ত মায়াঘাট দুর্ভোগ ভোগ করবে—তার সমৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত হবে এ আমরা সহ্য করতে পারি না।

—কখনই পারি না। সমর্থন করে সকলে।

—তবু ওরা হয়ত মিউনিসিপালিটির মিটিংএ হৈ-চৈ করতে পারে।

—পারে করুক। কেদার সান্যাল তাতে ভয় পায় না। অধর্মের কাছে ধর্ম কোনদিন মাথা নীচু করে দাঁড়ায় না। আর তাছাড়া একটু সবুর করে দেখ দুদিনের মধ্যে যে করে হোক মিউনিসিপালিটি আমরা হাত করে নেবো। আর যদি তা না পারি তাহলে গভর্ণমেণ্টের হাতে তুলে দিতে পর্যন্ত রাজী আছি কিন্তু এ রকম জুলুম—অন্যায় জুলুম আর আমরা সহ্য করতে পারবো না। আমাদের চোখে জনসাধারণের স্বার্থ অনেক বড় !

—হিয়ার···হিয়ার···।

কিন্তু সোমনাথের দ্বিধা তখনও কাটে নি। সোমনাথ বলে, কিন্তু কি করে মিউনিসিপালিটি বোর্ডের ওপর অনাস্থা আনবো আমরা ? একটা কিছু দেখানো ত চাই ?

—এ ত চোখের ওপর পড়ে রয়েছে ? এ আবার দেখাতে হবে নাকি ? তুমি কিছু মনে কোরো না সোমনাথ, তোমার ভালোর জন্যে সমস্ত মায়াঘাটের সর্বসাধারণের ভালোর জন্যে আমি নিজেকে উৎসর্গ করেছি। না হলে, এই বুড়ো বয়সে এই এত হাঙ্গামার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে

আমার কি লাভ বল। কেদার সান্যাল দম নেবার জন্যে একটু সময় নেন, তারপর বলেন, তোমার বাবা প্রথম এসে এই মায়াঘাটের পত্তন করেন। সেইজন্যে সমস্ত মায়াঘাট তাঁকে যথেষ্ট সম্মান দেখিয়েছে, শ্রদ্ধা দেখিয়েছে এমন কি আমরা যখন শুনেছি তোমার মায়ের ইচ্ছেতেই এই মায়াঘাটের জন্ম, তখন তাঁর স্মৃতির জন্যে এই জায়গার নাম মায়াঘাট হবে এ আমরা আজ পর্যন্ত অম্লানবদনে স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু তোমার বাবা ছিলেন রক্তমাংসের মানুষ, ভুলচুক যে তাঁর হবে না এমন ত' কথা নেই। তাই খালকাটার নাম করে বিরাট এক অনর্থক ঋণের বোঝা তিনি সমস্ত মায়াঘাটের উপর মায়াঘাট মিউনিসিপালিটির ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন—এটা তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থের ফল আর না বলে না হয় ভুল বলেই স্বীকার করে নিলুম। কিন্তু দেখ কত চেষ্টা করে আমরা মায়া ঘাটকে সেই অন্যায় ঋণের দায় থেকে উদ্ধার করেছি—

—একশোবার করেছি—। জনতা সমর্থন করে ওঠে।

—আস্তে, একটু আস্তে। ···তারপর অথচ দেখো তোমার বাবা আমাদের ওপর অন্যায় রাগ করে চলে গেলেন। যাই হোক আমাদের জনসাধারণের মুখ চেয়ে কাজ করতে হয়, তাই উপায় ছিল না চুপ করে থাকা ছাড়া···আর তুমিও সেটা তখন বুঝেছিলে। তোমার মনের জোরকে আমি প্রশংসা করি। তবু দেখো তোমার বাবার দলের সেই লোকেরা···এই ভারতজ্যোতির দল এরা এখনও নিজেদের স্বার্থের জন্যে নিজেদের গোঁ বজায় রাখবার জন্যে যা ইচ্ছে তাই করে যাচ্ছে। আর যেহেতু তারা আগে মিউনিসিপ্যাল বোর্ড গঠন করেছিল ঐ মিউনিসিপ্যালিটির এখনও তাদের বেশ কিছুটা জোর আছে, আর জোর আছে বলেই আমাদের কাজে তারা বাধা দিতে পারছে। এই যে মায়াঘাট সাপ্লাই কর্পোরেশন, যে সমিতি তোমার আমার সমস্ত মায়াঘাটের ভালোর জন্যে লড়ছে, এতকাল লড়ে এলো, অতবড় ঋণের দায় থেকে উদ্ধার করলে মায়াঘাটকে তাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার বেলা মিউনিসিপ্যালিটির কোনও টনক নড়ে না অথচ কিছু মনে করো না বাবা—তোমার মায়ের নামে সমস্ত সহরটার নামকরণ করেও তাদের

কৃতজ্ঞতা জানানো ফুরলো না। উপরন্তু মেমোরিয়াল পার্ক তৈরী করে তার ভেতর বিরাট এক স্মৃতিমন্দির তৈরী করে খালি জমি জুড়ে রেখে দিলে। আমি তোমার মাকে অসম্মান করছি না কিন্তু যেখানে জনসাধারণের স্বার্থ পদদলিত হচ্ছে সেখানে আমাকে মুখ খুলতেই হবে। আমরা বার বার করে বলছি ঐ পার্কের জমিতে আমরা যদি কারখানা বসাতে পারি তাহলে কতলোক করে খায় মায়াঘাট আরও কত আত্মনির্ভরশীল হতে পারে! ঐ পার্ক আমাদের চাই অথচ মিউনিসিপ্যালিটি আমাদের দেবে না। মিউনিসিপ্যাল বোর্ড আমাদের সাধারণের ন্যায্য দাবী ভোগ করতে দেবে না এর থেকেও অন্যায় কি আছে···এর থেকেও অক্ষমতা অকর্মণ্যতা কি আছে···। এই তোমাদের বলে রাখলুম যে এক নম্বর হল—আমাদের পূর্বদিকের বস্তির জমিতে কারখানা বসাতে হবে, দু'নম্বর মেমোরিয়াল পার্কের জমিতে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে কারখানা বসানো হবে আর তিন নম্বর যারা এতে বাধা দেবে,—সমস্ত মায়াঘাটের বিরুদ্ধে যারা বাধা দেবে বা যারা বাধা দিচ্ছে তাদের উৎখাত করতে হবে।

—নয়—

লাঠি চলছে!

একদিন এই মাটিতেই, কালাঝুরির বিরাট ভয়াবহ জঙ্গলে কুড়ুল চলেছিল সারিবদ্ধ হয়ে। সমস্ত জঙ্গলের স্তূপীকৃত অন্ধকারকে দূর করে বসাবে নতুন জনপদ!...

তারপর আর একদিন চলেছিল কোদাল—চওড়া চওড়া বুকের মত চওড়া চওড়া লোহার হাতিয়ার—কোদাল। তখন মানুষের বুকে ভরসা আছে এই কাটা খালে সমস্ত জনপদের সমৃদ্ধির পথ খোলা হয়ে যাবে! প্রসারিত হাতিয়ার হাতে, প্রসারিত বুকে, তারা সুদূর প্রসারিত স্বপ্ন দেখছে...

তারপর আজ দেখো সেই একই মাটিতে চলেছে লাঠি। বনস্পতির অরণ্যে নয়, স্তূপীকৃত মাটি আর আগাছার জঙ্গলে নয়, তোমার আমার রক্তমাংসের মানুষের ভীড়ের ওপর। যে মানুষরা দলবদ্ধ হয়ে জানাতে এসেছিল তাদের দাবী পথের ওপর, কেন তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হবে জমি থেকে? নেই বা হল নিজেদের জমি। কিন্তু এতদিন ধরে রক্ত জল করা পরিশ্রমের টাকায় বাড়তি ভাড়া গুণে গুণে যারা এতদিন মাথা গুঁজে রইলো সহরের একদিকে সবরকম সুবিধা আর স্বাচ্ছন্দ্যের এলাকার বাইরে, তারা আজ কোথায় যাবে?

এইটুকুই একসঙ্গে বলবার জন্যে তারা জড় হয়েছিল, এগিয়ে চলেছিল শোভাযাত্রা করে—শোভাহীন যাত্রা করে। এদের ওপরই লাঠি চালিয়েছে কেদার সান্যালের ভাড়াটে লাঠিয়ালের দল।

তোমরা হয়ত বলবে, এ ত হামেশাই হতে দেখছি। যারা বঞ্চিত তারাই সেই প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে যদি মৃদু নালিশ তুলতে চায় তাহলে

সেই নিরস্ত্র জনতার ওপর অস্ত্র চলে। তারা রক্তস্রোতে লুটিয়ে পড়ে। কিন্তু সেই রক্তপ্রবাহ মাটির ভেতর ঢুকে কোন বিদ্রোহের বীজকে প্রাণ দেয় কে বলবে ?···

এদের মধ্যে দু'চারটে বেশ চোট খেলে! বাকী সকলে ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে বাধ্য হল মারের মুখে।

দলের মধ্যে সবার আগে যে ছিল, যে ভরসা দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ওদেরকে, যে লাঠির মুখে সুদৃঢ় বুকখানা চিতিয়ে দিয়ে রুখতে চেয়েছিল অন্যায় পীড়নকে—দলনকে, সেও লুটিয়ে পড়লো লাঠির ঘায়ে। মাথাটা ফেটে গিয়ে রক্ত ঝরছে।

ওরা দেখলো এ লোকটা ওদের দলের একজন হলেও ওদের মত ঠিক নয়। চেহারায় আভিজাত্যের বলিষ্ঠ ইঙ্গিত, চোখে মুখে বুদ্ধির আর শিক্ষার দীপ্তি ও প্রাখর্য। ওকে দেখেই কেদার সান্যালের দল চিনতে পারলে ঐ ধরণের লোককে পথের মাঝে লাঠির ঘায়ে লুটিয়ে দেওয়ার গুরুত্ব, তাই ঠিক করলে তাড়াতাড়ি সরিয়ে ফেলতে হবে ঘটনাস্থল থেকে। কিন্তু তবু চিনতে পারলে না যে সে আর কেউ নয়—ইন্দ্রনাথ!

ইন্দ্রনাথের আহত দেহটা ওরা নিয়ে এসে ফেললো সোমনাথেরই বাড়ীতে যেখানে উপস্থিত ছিলেন কেদার সান্যাল। ওর অজ্ঞান ভাবটা তখনও কাটেনি তাই ইত্যবসরে কিছু একটা যে ওরা করে বসতো সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু খবর পেয়ে সুরেশ্বর দলবল নিয়ে দেখতে এসেছিল কে এই অচেনা যুবক, যে আজ নির্ভয়ে পরিচালনা করলে লোকগুলোকে আর তারপর লাঠির মুখে বুক পেতে দিলে। যদিও ওকে দেখে চিনতে পারলে না ও কে তবু এমন হৈ-চৈ সুরু করে দিলে যে কেদার সান্যাল ও কেদার সান্যালের দল কোনও কথা বলতে পারলে না। শেষে সুরেশ্বর নরেশের সাহায্যে ইন্দ্রনাথকে ধরাধরি করে নিজেদের দলের মধ্যে নিয়ে গেল সেবা করবার জন্যে।

সোমনাথ একবার দেখেছিল ঐ যুবককে, রক্তাপ্লুত দেহ নিয়ে শুয়ে আছে। ওর ঐ শুয়ে থাকার মধ্যেও কেমন একটা বীরত্ব ছিল

যা সোমনাথ উপলব্ধি না করে পারে নি। তবু চিনতে পারেনি ওকে ইন্দ্রনাথ বলে। কি করে চিনবে? সেই যে শিশু ইন্দ্রনাথ ত্যাগ করে চলে গেছে মায়াঘাটকে আর ত ফেরে নি। তারপর মধুবনীর তালুকে নিয়ে গিয়ে শিবনাথ আর মাষ্টার তাকে মানুষ করছে, সঙ্গে আছে সাধন, এই পর্যন্তই শুনেছে সে লোকমুখে, চোখে দেখে নি। সেই ইন্দ্রনাথই যে এমনি মানুষ হয়ে, শুধু মানুষ নয়, বীরের মত মানুষ হয়ে এমনি করে লড়বে এইরকম নিরস্ত্র সৈনিকের মত; সমস্ত আদর্শ, সমস্ত শিক্ষা, ইচ্ছাশক্তি, ভালবাসা দিয়েও শিবনাথ সোমনাথকে যে পথ চেনাতে পারে নি সেই শিবনাথই আর এক পুরুষকে সেই পথ চিনিয়ে এমন করে পাঠিয়ে দেবে এ কথা কল্পনার মধ্যেও আনতে পারে নি সোমনাথ! হাজার হলেও চৌধুরী বংশের রক্ত, সোমনাথের রক্ত বইছে ইন্দ্রনাথের শিরায় শিরায়! কিন্তু আশ্চর্য, সেই রক্তেরই লাল বন্যার ভেতর শায়িত ইন্দ্রনাথকে চিনতে পারলো না আগের পুরুষের মানুষ সোমনাথ!

শোভনাও দেখেছিল একবার! যেমন করে প্রথম ভোরের লাল আলোয় রাতকানা পাখী জেগে উঠে চারদিক পানে তাকায় কিন্তু রাতের কালোর জড়তা কাটিয়ে কিছুই বুঝতে পারে না ভালো করে। কেবল ভেতরকার আলোর জাগরণীর ছটফটানীতে স্থির থাকতে পারে না বাসার মধ্যে, বেরিয়ে পড়ে ডাকতে ডাকতে আলোর পানে। শোভনাও তেমনি লাল রক্তে ভেজা আহত কালচে শরীরখানা দেখে চিনতে পারলে না ইন্দ্রনাথকে। কিন্তু তবু মনের ভেতরে কিসের একটা অস্বস্তিতে যেন চমকে উঠতে লাগলো সে। বললে, ও ছেলেটি কে গো? চেনো তুমি?

—না। সোমনাথ জবাব দেয়। কাদের বাড়ীর ছেলে মাথার মধ্যে যত সব পাগলামো ঢুকেছে ক্ষ্যাপাতে এসেছে ওদের!

একেবারে এড়িয়ে গেল সোমনাথ!

খবর এসেছিল—উড়ো খবর—যে, দামোদরের উৎপত্তির মুখে নাকি জলের তোড় দেখা দিয়েছে এইবার বন্যা আসবে সমভূমিতে—কিন্তু

নীচের মানুষগুলো এমনই বিশেষ করে যাদের ওপর ভার আছে, দায়িত্ব আছে বাঁধ রক্ষা করবার, তারা অজান্তে এমন করে উড়িয়ে দিলে সেই খবর যে কোন ব্যবস্থাই হল না সময় মত বাঁধ রক্ষা করবার। ফলে এমন হল যে সত্যিই যদি জলের তোড় নেমে আসে তাহলে বাঁধ দিয়ে ঠেকানো যাবে না!

তবু, শোভনা মনে মনে আশীর্বাদ করলে এই অপরিচিত বীরকে, যে এমন করে দাঁড়িয়েছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে। মায়ের মতই আশীর্বাদ করলে। ...মনে পড়লো শিবনাথকে...মনে পড়লো ইন্দ্রনাথ তার কাছে থাকলে হয়ত ঐরকমটিই হত।

এটা মায়েদের ধর্ম, ছেলের বয়সী কোন ছেলে দেখলে, তার মুখের ভেতর দিয়ে প্রচ্ছন্নভাবে আপন ছেলের মুখ দেখে!

শান্তির ওপরই ভার পড়েছে ইন্দ্রনাথকে দেখবার! ভূপতি আর সুরেশের সাহায্যে শান্তিই যত্ন করে ইন্দ্রনাথের মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে শুইয়ে রেখেছিল ওদের প্রেস ঘরের পাশের ঘরখানায়!

ভূপতি বলেছে শান্তিকে, তুই আমাদের দলে কাজ করতে চেয়েছিলি না? এই নে, তোকে মস্ত কাজ দিলুম...সেবা কর দেখি ছেলেটার...। দেখিস যে আমাদের মায়াঘাটের জন্যে প্রাণ দিতে গেছলো সে যেন প্রাণের পরিচয় পায় আমাদের কাছে।

আঘাতের ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিল ইন্দ্রনাথ। সন্ধ্যের মুখে ঘুমটা ভেঙ্গে যেতে দেখলে মাথাটা বেশ হালকা বোধ হচ্ছে। তাই মাথাটা তোলবার চেষ্টা করলে ও একবার। কিন্তু, তুলতে না তুলতেই ওপাশ থেকে শান্তি বলে উঠলো উহুঁহুঁ...মাথা তুলবেন না, মাথা তোলা আপনার বারণ।

ইন্দ্রনাথ ফিরে দেখলে শান্তি ঘরের এক পাশে বসে বসে বই পড়ছে, ব্যাণ্ডেজ বাঁধবার সময় ওর জ্ঞান ফিরে আসে। তখনই পরস্পরের মধ্যে পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। তাই ইন্দ্রনাথের চিনতে একটু কষ্ট হল না। হাসতে হাসতে বললে, তবে কি আমার মাথা নত হয়েই থাকবে বলছেন?

শান্তি চেয়ে দেখলে ওর মুখের দিকে। বললে, বাব্বা মাথায় অতবড় ব্যাণ্ডেজ তবু আপনি হাসছেন? জানেন কিরকম জোর চোট লেগেছে আপনার?

—জানি। তবে কি জানেন জীবনে হাসবার সুযোগ এত কম আসে যে একবার সুযোগ পেলে হাসিটা ছাড়তে পারিনে সহজে। হেসে নিই।

—যা হয় করুন গে। তবে এটা মনে রাখবেন আজ সুরেশ দা না থাকলে—

ইন্দ্রনাথ শান্তির কথাটা কেড়ে নিয়ে নিজেই সম্পূর্ণ করে দেয়। বলে, না থাকলে চিরদিনের মত হাসবার সুযোগটা লোপ পেয়ে যেতো ...আর এই মাথাটা শুধু নত নয় একেবারে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যেতো, কি বলেন?

শান্তি কোন জবাব দিলে না।

—তা ইচ্ছে আছে সুরেশ বাবুর সঙ্গে দেখা হলে বলে রাখবো যে তিনি আমার মাথাটা কিনে নিয়েছেন।

বলতে বলতে ইন্দ্রনাথ মাথা দুলিয়ে আর এক দফা হেসে উঠলো।

—আঃ কথা শুনছেন না কেন? শান্তি বেশ আদেশের সুরেই বলে উঠলো, অত মাথা বাঁকালে ব্যথা বাড়বে যে!

—ও। তা মাথা যার নেই তার আবার মাথা ব্যথা, কি বলেন?

নাঃ, এ লোকটা যেন জোর করেই হাসবার জন্যে তৈরী হয়ে এসেছে এখানে। শান্তি বুঝে উঠতে পারলে না, কি করবে। বললে, দেখুন আমাকে বলা হয়েছে আপনি যাতে চুপ করে বিশ্রাম করতে পারেন তা দেখবার জন্যে তা আপনি যদি ইচ্ছে করে কষ্ট পান নড়াচড়া করেন তাহলে আমি কি করতে পারি বলুন!

—কিন্তু দেখুন আপনি হয়ত বিশ্বাস করতে পারছেন না সত্যিই আমার আর বিশেষ কোন গ্লানি নেই...। সত্যি আমি এখন...মনে হচ্ছে দিব্যি খানিকটা বেড়িয়ে আসতে পারি বাইরে থেকে...। তাছাড়া এভাবে শুয়ে থাকলে ত চলবে না...কত কাজ আমাদের বাকী। কত বড় আশা নিয়ে আজ আন্দোলন সুরু হয়েছিল কিন্তু কি হয়ে গেল!

চোখের ওপর লাঠি চালালে ওরা···তবু যারা মার খেলে তারা এই জেনে মার খেলে যে তাদের ন্যায্য দাবী ঘোষণা করাটাই হল অপরাধ···! এখন সামান্য এই আঘাতের ভয়ে চুপ করে শুয়ে থাকলে কি করে চলবে? হাসিমুখে সমস্ত ব্যথা ক্ষত ঝেড়ে ফেলে দিয়ে জোর করে উঠে দাঁড়াতে না পারলে কি করে চলবে বলুন?

আশ্চর্য লোক, হয় উত্তেজিত হয়ে ওঠে না হয় হাসতে থাকে, মাথা চালায় অথচ এ দুটোই খারাপ বর্তমানে ওর পক্ষে। মুস্কিলে পড়ে যায় শান্তি মাঝখান থেকে। বলে, জোর করে উঠবো বললেই ত আর ওঠা হচ্ছে না আপনার।

—ও, আপনারা জোর করে ধরে রাখবেন বুঝি?

—নিশ্চয়ই, আপনার শরীরের এখন যা অবস্থা তাতে কোনমতেই আপনাকে নড়াচড়া করতে দেওয়া চলতে পারে না।

—আপাততঃ পড়েছি যখন মোগলের হাতে তখন খানা খেতেই হবে। বলতে গিয়ে আর একবার হেসে উঠলো ইন্দ্রনাথ।

শান্তি চেয়ে চেয়ে ওর হাসি দেখছিল। ওকে যখন প্রথম আসতে দেখেছিল সে—আসতে অবশ্য দেখে নি ঠিক, বয়ে আনতে দেখেছিল ধরাধরি করে—তখন সেই রক্তাপ্লুত বীর মূর্তি দেখে ভাবতে পেরেছিল কি ঘুণাক্ষরেও যে এই লোকটাই কথায় কথায় হাসির তুফান তুলতে পারে অবিরল ভাবে?

কি বলবে ঠিকমত গুছিয়ে তোলবার আগেই ইন্দ্রনাথ আবার বললে, কিছু যদি মনে না করেন ত' একটা কথা বলি—

শান্তি টপ্ করে বললে, ইচ্ছে হয়ে থাকে বলতে পারেন···মনে করা না করাটা আমার ইচ্ছের ব্যাপার, আপনার নয়!

—নিশ্চয়ই! অতি সহজ করে নিলে ইন্দ্রনাথ জবাবটা। দেখুন, আমাদের এ পথে মেয়েদের কাজ করার একটা প্রধান অসুবিধে কি জানেন? একদিক দিয়ে সেবা যত্ন দিয়ে যেমন অনেক আঘাতকে তারা ভুলিয়ে দিতে পারে, তেমনি বার বার যত্নের প্রশ্ন তুলে মনে করিয়ে দেয় আঘাতটাকে বেশী করে। বিপ্লবের মধ্যেও গৃহের সুখকে খুঁজে আনতে চেষ্টা করে···তাতে কাজের ক্ষতি হয় খানিকটা। ঠিক নয় কি?

শান্তি আপনার থেকেই গম্ভীর হয়ে গেল। বললে, তার মানে আপনি বলতে চান আমি আপনার—

ধীরে ধীরেই এগোচ্ছিল শান্তির কথাগুলো। কিন্তু শেষ হবার আগেই বাধা দিয়ে বলে উঠলো ইন্দ্রনাথ, না না না না না আপনি তা মনে করছেন কেন?

অস্পষ্ট রকম হাসি হাসতে লাগলো ইন্দ্রনাথ।

নাঃ। কেমন একটা অজ্ঞাত অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো শান্তি বসে বসে। এবং অনেকক্ষণের মত চুপ করে গিয়ে সেই অস্বস্তির একটা কিনারা হাতড়াতে লাগলো মনে মনে।

খানিক পরে ইন্দ্রনাথই আবার কথা সুরু করলে। বললে, আমার না হয় নড়াচড়া, হাসা বারণ তাই বলে আপনিও যদি ঐ ভাবে চুপ করে বসে থাকেন তাহলে চলে কি করে? খানা খেতে হবে বলেই একেবারে জাত মেরে দেবেন না যেন!

—তবে কি করবো বলুন! আপনার মত অত হাসতে ত পারবো না!

কথাটা শুনে এবং বলে উভয়েই গম্ভীর হয়ে গেল। আসলে শান্তি কথাটা না ভেবেই হঠাৎ বলে ফেলেছে যেমন বেশ পাতলা মিহি কাপড় বোনা হতে হতে এক জায়গায় হঠাৎ খানিকটা সুতো জট পাকিয়ে ধ্যাবড়া হয়ে যায়!

ইন্দ্রনাথ কিন্তু চুপ করে রইলো না। বললে, দেখুন আগেও কথাটা হাসির ছলে বলেছিলুম আর এখনও বলছি জীবনে হাসবার সুযোগ এতই কম আসে তাই একবার সুযোগ পেলে সহজে ছাড়ি নে। হেসে নিই। অবশ্য একথা হয়ত বলবেন যে, এ সব হাসির মধ্যে আন্তরিকতা নেই। তা থাকবে আর কি করে বলুন? দেখলেন ত চোখের ওপর কতগুলো লোকের মাথা ফেটে দু'ফাঁক হয়ে গেল পলকের মধ্যে!

—আর তবু বলছেন কোনও রকমে জোর করে সমস্ত আঘাত ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ওদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বেন!

সূতোর সেই হঠাৎ জটলাটা পেরিয়ে আবার মিহি বুনন চলতে সুরু হয়ে গেছে।

—তাছাড়া উপায় কি বলুন! যুদ্ধ যারা করবে তারা আঘাতের ভয়ে পিছিয়ে এলে চলবে কি করে?

—কিন্তু এমনি অন্যায় আঘাত সহ্য করার পথের চেয়ে অন্য পথ ত' রয়েছে যুদ্ধ করবার! এই যে ভারতজ্যোতি আজ দিনের পর দিন সংগ্রাম করে চলেছে···মশালের মত জ্বালিয়ে রেখেছে যুদ্ধের প্রেরণাকে—

—জানি আমি সে কথা! তবে কি জানেন শত্রুর সংখ্যা আমাদের এত বেশী, শত্রু আমাদের এত শক্তিশালী সকল দিক দিয়ে যে, যতরকম উপায় আছে পন্থা আছে সকল দিক থেকে আমাদের আঘাত করতে হবে তবে যদি কোন ফল পাওয়া যায়।

—তাই বলে নিজেকে এমনি করে আহত করতে হবে? আপনি দেখতে পাচ্ছেন না কি রকম লেগেছে আপনার···রক্ত দেখে ত আমার ভয় লেগে গিয়েছিল—

—হুঁঃ। ইন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ পর একটু হাসলে আবার। রক্তের কথা বলছেন? এ ত কি সামান্য রক্ত! এক এক সময় কি মনে হয় জানেন যদি আঁজলা আঁজলা ভরে রক্ত ছড়িয়ে দিতে পারলে কিছু কাজ হয়··· ।···

—এ আপনি আবেগের কথা বলছেন। যাদের জন্যে আপনি এত করবেন তারাই হয়ত ফিরে চাইবে না আপনার দিকে।

—এ সব কি বলছেন আপনি? মাথাটা দুলিয়ে বলে ইন্দ্রনাথ। শোভনার কাছ থেকে উত্তেজনার মুহূর্তে মাথা দোলাবার স্বভাবটা পেয়ে গেছে নাকি সে?

—বলতে ভাল লাগে না বটে কিন্তু তবু বলতে হয়। আমি শুনেছি দাদুর মুখে যে, এই মায়াঘাট যিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই শিবনাথবাবু—সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে যিনি খাটলেন মায়াঘাটের উন্নতির জন্যে, সেই শিবনাথবাবুকে এই দেশের লোকেরাই কেদার সান্যালের

কথায় অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে মায়াঘাট থেকে···তবু আপনি আস্থা রাখেন এই সংগ্রামের ওপর ?

সত্যি সত্যিই হাসলে এবার ইন্দ্রনাথ। তাই হাসিটা বাইরে প্রকাশ পেলো না শাস্তির সামনে। শিবনাথ, যিনি মায়াঘাটের প্রতিষ্ঠা করলেন নিজের জীবন দিয়ে সেই শিবনাথকেই অপমানের বোঝায় মাথা হেঁট করে ছেড়ে চলে যেতে হল এই মায়াঘাট থেকে খুব সত্যি কথা। কিন্তু তাঁর চলে যাওয়াটাই কি সত্যি হয়ে রইলো, আর ব্যর্থ হয়ে গেল তাঁর সত্যের আর আদর্শের নিষ্ঠা ? তাঁর ন্যায়ের সংগ্রাম ? না দ্বিগুণ হয়ে ছড়িয়ে পড়লো ইন্দ্রনাথের রক্তের কণায় কণায় ?···হাসি পেলো ইন্দ্রনাথের। আশ্চর্য, শাস্তি যদি চিনতো ইন্দ্রনাথকে। যদি জানতে পারতো সোমনাথের মরুভূমি পার হয়ে শিবনাথের আদর্শের বীজ আবার সজীব হয়ে ফুটে উঠেছে···। যে বীজের গোড়ায় গোড়ায় রস জোগাবে বিদ্রোহীর তাজা রক্ত !

ইন্দ্রনাথের মনটা হাসিতে দুলছিল, তাই বোধ হয় মাথাটা আর তুলালো না। ওপাশের খোলা জানালা দিয়ে দেখা গেল আকাশভরা তারার মেলা বসেছে। যে তারারা মায়াঘাটের আত্মার সঙ্গে কথা কয়।

তাই ইন্দ্রনাথ নিজে নয়, ইন্দ্রনাথের মনে হতে লাগলো যে, ঐ লক্ষ লক্ষ তারাই প্রত্যেকে আলাদা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

ওদের দৃষ্টি শুধু দৃষ্টি নয়, যেন কোন অজানা আশীর্বাদের মুখর নৈঃশব্দ জল জল করছে।

—দশ—

নিজের প্রকৃত পরিচয় না দিলেও ইন্দ্রনাথ রীতিমত যোগ দিয়েছে ওদের কাজে। তাই আজ সমস্ত গণ-আন্দোলনের গোড়ায় সবার অগ্রভাগে দেখা যায় ইন্দ্রনাথকে। ইন্দ্রনাথ সমস্ত মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের সভ্যদের কাছে গিয়ে গিয়ে অনুরোধ করছে তারা আগামী অধিবেশনে যেন মায়াঘাটের প্রতিষ্ঠাতা শিবনাথ চৌধুরীর সম্মান রাখে, তারা যেন মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃত্ব, কৌশল করে মায়াঘাট সাপ্লাই কর্পোরেশন তথা কেদার সান্যালের হাতে তুলে না দেয়। মানুষের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যে অন্যায়—শুধু অন্যায় কেন রীতিমত পাপ, সেটা যেন তারা মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী পরধনলোভিদের পাকচক্রে ভুলতে না বসে। এদিকে ভারতজ্যোতির পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় অগ্নিবর্ষণ হয়ে চলেছে। মশাল জ্বলছে মুখের ভাষায়, হাতের লেখনীতে, কর্মের বন্যায় আন্দোলনের শিখায় শিখায়!

রুখতে হবে। রুখতে হবে এই বিপ্লবীদের, এই বিপ্লবকে, এই পণ করে রুখে দাঁড়ালো কেদার সান্যালের দল!

কিন্তু, রুখবে কাকে? বিপ্লব আজ ছড়িয়ে পড়েছে—মিশিয়ে গেছে মানুষের রক্তে, যেমন করে লাল রক্তে মিশিয়ে থাকে শ্বেতকণিকার ঝাঁক যাদের আলাদা করে দেখা যায় না, আলাদা করে ধ্বংসও করা যায় না ইচ্ছেমত!

তাছাড়া এই চিরলাঞ্ছিত মানুষের দল যারা ঘুমিয়েছিল বহুদিন তারা যখন জাগে তখন ভীষণভাবে জাগে, খুব বেলাতে ঘুম ভাঙ্গলে আলোর চটকায় যেমন চমক খেয়ে ছুটে পালায় ভীরু ঘুম—যায় নির্বাসনে!

কিন্তু অন্যপথ জানা আছে কেদার সান্যালের। যে পথ ঘোরালো হলেও নির্দিষ্ট, পিচ্ছিল হলেও সহজ। যে পথের পথিক বলে সন্দেহ করতে সঙ্কোচ হবে তোমার কেদার সান্যালের মত মুখোশ-পরা লোকদের। অথচ ওরা গিয়ে পৌঁছবে ওদের গন্তব্যে!

শান্তির কাছে খবরটা সবাই শুনল। শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল। প্রেস ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে!

সত্যিই কেদার সান্যালের ভাড়াটে গুণ্ডার দল ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছে ভারতজ্যোতি প্রেস দুপুরের নির্জনতার মধ্যে। ভূপতি মুখুজ্যে বিশ্রাম করছিলেন, শান্তি সংসারের কাজ করছিল, এমন সময়ে গুণ্ডারা এসে হানা দেয়। প্রেসের ওপর মুগুরের ঘা শুনে শান্তি ছুটে আসে। মেয়ে বলে গুণ্ডারা তার সম্মান রাখে নি। ধাক্কা দিয়ে তাকে ঘর থেকে বার করে দিয়ে তারা দরজায় খিল তুলে দেয়। তারপর অবাধে চলে ধ্বংসের তাণ্ডব লীলা। ভূপতি মুখুজ্যে চমকে ঘুম থেকে জেগে উঠে সন্ত্রস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, কি হচ্ছে কি ওখানে? তিনি তাড়াতাড়ি সেখানে ছুটে যাবার চেষ্টা করেন।

শান্তি কান্না চেপে তাঁকে এসে জড়িয়ে ধরে—না, না, দাদু ওখানে তোমার যাওয়া হবে না।

ভূপতি মুখুজ্যে পাগলের মত ছটফট করতে থাকেন। বুঝতে আর তাঁর কিছু বাকি নেই। প্রেসের ওপর হাতুড়ির ঘা গুলো যেন তাঁর হৃদপিণ্ডে এসে লাগে। প্রেসের টাইপ আর ফর্মা নয়, মনে হয় তাঁর মাথার ভেতরই সমস্ত চিন্তা ভাবনা যেন ওরা তছ্‌নছ্‌ করে দিচ্ছে।

—আমায় ছেড়ে দে, ছেড়ে দে,—তিনি চীৎকার করে ওঠেন।

কিন্তু শান্তি তাঁকে ছাড়ে না, কাতরভাবে বলে, না দাদু, ওরা জন্তু জানোয়ার হলেও তোমায় ছেড়ে দিতাম, কিন্তু ওরা তাও নয়'—ওরা দম দেওয়া কলের দানব, মানুষের কোন কিছুর মর্যাদা ওদের কাছে নেই।

ভূপতি মুখুজ্যে বাজপড়া গাছের মত এবার ভেঙ্গে পড়েন। ভাড়াটে গুণ্ডারা তাদের হুকুম তামিল করে চলে যায়। সমস্ত প্রেস-বাড়িতে শ্মশানের স্তব্ধতা।

বেলা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একে একে সবাই এসে হাজির হয়। প্রেসের চেহারা দেখে সবাই স্তব্ধ হয়ে যায়। একটা আর্তনাদ করবার মত শক্তিও কারুর নেই।

অবশেষে আসে ইন্দ্রনাথ। ভূপতি, সুরেশ্বর, নরেশ, শান্তি, [illegible] প্রভৃতি ঘরের নানা জায়গায় নিষ্প্রাণ পাথরের মূর্তির মত বসে আছে। ঘরে ঢুকে প্রথমটা ইন্দ্রনাথের যেন হঠাৎ দম বন্ধ হয়ে আসে, আকস্মিক অপ্রত্যাশিত আঘাত পেয়ে। তারপর তার মুখ ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে আসে। সুরেশ্বরের কাছে গিয়ে সে দাঁড়ায়। সুরেশ্বর তার দিকে চেয়ে ম্লান ভাবে একটু হাসে। এমন হাসি সুরেশ্বরের মুখে কেউ কখন আগে দেখেনি।

কি দেখছ ইন্দ্রনাথ, ভারতজ্যোতির একটা কণা আর দেখতে পাচ্ছ? শুধু আমাদের আশার ছাই ছড়িয়ে আছে। —সুরেশ্বরের মুখের হাসিটুকুও শেষ কথার সঙ্গে মিলিয়ে গেল।

ভারতজ্যোতি তাহলে কাল আর বার হবে না!— ইন্দ্রনাথের মুখ এখনো কঠিন।

—উপায় কি আছে বল ভাই। শুধু হাতে করবার কাজ 'এ'ত নয়।

—শুধু হাতেই এ কাজ আমরা করব। যে করে পারি সবাই মিলে হাতে করে ছেপে বের করবো কাগজ!

—সত্যি বলছো? সত্যি বলছো ইন্দ্রনাথ? পারবে তোমরা? পারবে? উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে ভূপতি।

—কেন পারবো না? আসুন সুরেশদা আমরা কাজ আরম্ভ করে দিই।

—কানাই কোথায়, কানাই? তার ওপর ভার ছিল আজকের সম্পাদকীয় লেখবার।

—কানাই আসবে না সুরেশদা, এলেও আজ আমরা তাকে গ্রহণ করতে পারবো না।

—তুমি এসব কি বলছো ইন্দ্রনাথ?

—আমি ঠিকই বলছি সুরেশদা। টাকার প্রলোভন দেখিয়ে

কেদার সান্ন্যালের দল হাত করে নিয়েছে কানাই বাবুকে।—শুধু তাই নয় আমি ঘুরে ঘুরে খোঁজ নিয়ে দেখেছি টাকার লোভ দেখিয়ে মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের বহু সভ্যকে হাত করে নিয়েছে ভেতরে ভেতরে —আমাদের বিপদ শুধু একদিকে নয় সুরেশদা, চারিদিকে।

—তাই হয় ইন্দ্রনাথ! আগুন যখন ধরে তখন ঝড় এসে যোগ দেয় তার সঙ্গে।···কিন্তু আমাদের সম্পাদকীয় কে লিখবে তাহলে।

—আমি লিখবো যদি অনুমতি দেন!

শান্তি এতক্ষণে ভাল করে ইন্দ্রনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলে। এই ইন্দ্রনাথই বলেছিল সেদিন, আমাদের পথ আলাদা তবে বিপদ আমাদের এতদিকে যে সব দিক থেকেই আমাদের আঘাত হানতে হবে। কিন্তু তবু—

—তবে তাই কর ভাই···তুমিই পারবে···তুমিই পারবে···

—তাহলে চলুন···আপনারা দেখুন ছাপাবার কতদূর কি করতে পারেন আর আমি ততক্ষণ দেখি অপটু হাতে কি লিখতে পারি···।

—আর কমপোজ্ করবে কে?

—আমি করবো সুরেশদা। এগিয়ে এসে বল্লে শান্তি।

ইন্দ্রনাথ চেয়ে দেখলে শান্তির মুখের দিকে। একে দেখেই বলেছিল সে সেদিন, আপনারা এর মধ্যেও সেবায় যত্নে গৃহ সুখের স্বাদ এনে দেন আর সেই সঙ্গে মনে করিয়ে দেন দুঃখের অনুভূতিকে। কিন্তু আজ ওর সাহচর্যে শুধু কি দুঃখের—শুধু কি আঘাতের অনুভূতিকেই স্মরণ করিয়ে দেবে?

সুরেশ্বর বললে, কিন্তু,—ওরা সমস্ত ডিষ্ট্রিবিউশন বোর্ড তছনছ করে দিয়ে গেছে তার ভেতর থেকে টাইপ বেছে নেওয়া, সে যে ভীষণ খাটুনীর ব্যাপার···

—আপনি কিচ্ছু ভাববেন না সুরেশদা সে আমি ঠিক বেছে নেবো। শান্তির কণ্ঠে দৃঢ়তার আগ্রহ ফুঠে উঠেছে।

—নিতে পারবি ত দিদি? ভূপতিও একটু যেন চিন্তিত হয়ে বলেন।

—কেন পারবো না দাদু? তোমরা পুরুষ মানুষ তোমাদের ঐ

বাছাবাছির ব্যাপারে বড় বেশী ভয় কারণ তোমরা ঘাড় হেঁট করে এক মনে বাছতে অভ্যস্ত নও তাই তার কথা ভাবতে তোমরা হাঁপিয়ে ওঠো···কিন্তু আমরা মেয়েরা সংসারের কাজে চাল ডাল মশলা এই সব বাছতে খুব অভ্যস্ত ওতে আমরা একটুও ভয় পাই না।···আর এ ত বড় বড় টাইপ!—

কথাটা শেষ করে শান্তি ইন্দ্রনাথের দিকে একবার না তাকিয়ে পারলে না। ইন্দ্রনাথের মুখে অস্পষ্ট রকমের হাসি সেদিনকার মত!

জল যখন ঢালুর দিকে নামে তখন নিতান্ত শান্ত স্রোতও খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলে। তাই অপটু হাত হলেও অতি অল্প সময়ের মধ্যেই গড়গড় করে ইন্দ্রনাথ সম্পাদকীয় লিখে শেষ করে ফেললে। এতদিনের ধ্যানধারণা, এতদিন যা শুধু কয়েকটা দাবীর ঘোষণায় সীমাবদ্ধ ছিল সেই অন্তর্নিহিত মর্মকথা এতদিনে প্রকাশের পথ পেয়ে স্বাভাবিক পরিণতির দিকে প্রবল স্রোতে প্রবাহিত হয়ে গেল।

একেই ত ডিষ্ট্রিবিউশন আর কমপোজিশনের কাজ অভ্যেস সাপেক্ষ। তার ওপর সমস্ত টাইপ গুণ্ডার দল তছনছ করে দিয়ে গেছে। কাজেই ঐ সময়ের মধ্যে শান্তি কিছুই গুছিয়ে উঠতে পারলো না। কেবল সর্বশরীর ওর ছপ্ ছপে হয়ে ঘেমে উঠলো। কপালের দুপাশে গুচ্ছ গুচ্ছ চুল ঘামে ভিজে লেপটে গেল কপালের সঙ্গে। আর টাইপের কালি আঙ্গুলে নখের মধ্যে ঢুকে একেকার হয়ে গেল।

লেখা শেষ করে ইন্দ্রনাথ বললে, দাঁড়ান আমি দেখছি। আপনি একলা পেরে উঠবেন না।

শান্তি বললে, কখ্খনো না! দস্তুর মত ডিভিসন অব্ লেবার চলছে এখানে। এ পথ আপনার নয়!

ইন্দ্রনাথ হাসলে। খুব শান্ত আর সরল হাসি অথচ সে হাসি পাহাড়ের নীচু গর্ত থেকে উৎসারিত শুভ্র ফেনময় ঝর্ণার জলের মত জোরালো অথচ সুন্দর। বললে, কিন্তু বিপথ ত নয়! মনে রাখবেন সময় আমাদের অল্প অথচ অনেক কাজ বাকী এখনও। শুধু ত' কমপোজ নয় হ্যাণ্ডপ্রেসে সবাই মিলে ছেপে তুলতে হবে।···

—কিন্তু তাহলে আপনার থিয়োরী [illegible]য়ে যাবে!

—আমার থিয়োরী? ইন্দ্রনাথ ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না

—হ্যাঁ, আপনার থিয়োরী! আপনি বলেছিলেন এ সব কাজে মেয়েরা নামলে স্মরণ করিয়ে দেয় গৃহসুখকে—

আরও কি বলতে যাচ্ছিল শান্তি কিন্তু সেদিনকার মত প্রবল উৎসাহে মাঝ পথে ওকে থামিয়ে দিয়ে ইন্দ্রনাথ বললে, ব্যস্ ব্যস্ যেতে দিন সে সব। দেখছেন না আজকের থিয়োরী আর প্র্যাক্টিস্ দুটোই আগাগোড়াই অন্য জাতের। সেদিন আমায় দেখেছিলেন লাল রক্তের মধ্যে আর আজ একেবারে কালো কালির আবর্তে। এ দুয়ের ধর্ম এক কি করে হয় বলুন?

এর পরে কি বলবে শান্তি কিছুই খুঁজে পেলে না। অগত্যা ইন্দ্রনাথকে কাজে লাগতে দিতে হল। আর খানিকক্ষণের মধ্যে সত্যিই দেখা গেল কালিতে ঝুলিতে ইন্দ্রনাথের হাত একেবারে চিত্র-বিচিত্র হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয় অন্যমনস্ক হয়ে কালি-মাখা হাতে মুখের ঘাম মুছতে গিয়ে ইন্দ্রনাথ যা করে বসলো তাতে শান্তি হো-হো করে না হেসে উঠে পারলে না।

শান্তির এই হঠাৎ—হাসিতে প্রথমটা বিচলিত হয়ে পড়লেও পরক্ষণে সামলে নিয়ে ইন্দ্রনাথ বললে, দেখলেন ত, গোড়াতেই বলছিলুম লাল আর কালোর ধর্মটা এক নয়। সেদিন আমার রক্তমাখা কপাল দেখে আপনি শঙ্কিত হয়েছিলেন আর আজ কালিমাখা দেখে প্রাণ খুলে হাসছেন!

হাসি থামিয়ে শান্তি বললে, উকীল হলে ভাল করতেন আপনি!

—না হয়েই বা ওকালতি কি কমটা করছি বলুন! সে না হয় তকমা-আঁটা বিচারকের সামনে বাঁধা বুলি আওড়ে আর এ না হয় ন্যায়ের দণ্ডের সামনে প্রাণের কথা বলে···কি বলেন?

হাসির মধ্য দিয়ে কাজ আরম্ভ করলেও সমস্ত লেখাটা কম্পোজ শেষ করে যখন উঠলো তখন ওদের মুখের কথা বন্ধ হয়ে গেছে। সমস্ত দেহ আড়ষ্ট হয়ে গেছে ক্রমাগতঃ ঝুঁকে ঝুঁকে।

তারপর চললো সারারাত ধরে ভাঙা হ্যাণ্ড প্রেস কোন রকমে জোড়া দিয়ে ছাপানোর পালা। আর পরের দিন ভোরবেলা দেখা গেল মোড়ে মোড়ে যথারীতি হকারের দল কাগজ নিয়ে চীৎকার করছে 'ভারতজ্যোতি' 'ভারতজ্যোতি'…।

চীৎকারটা কানে গেল কেদার সান্যালেরও! শুনে তাঁর মনের অবস্থাটা যা হল তা অনেকটা হৃদয়ঙ্গম হবে যদি ভাবতে পারো কেউ সারারাত ট্রেণ ভ্রমণ করে ঘুম ভেঙ্গে দেখলে রাত্তিরে ট্রেণ চড়তে ভুল হওয়ায় বোম্বে যেতে হাজির হয়েছে দিল্লীতে!

শুধু তাই নয়, কিছু বেলা বাড়তেই দেখা গেল বিরাট এক জনতা এসে জড় হয়েছে মিউনিসিপালিটির বাড়ীর আশপাশে। ঐ জনতার পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে ইন্দ্রনাথ, দাঁড়িয়েছে শান্তি। আজকের মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের সভায় কেদার সান্যালের দল অনাস্থা প্রস্তাব আনবে মিউনিসিপ্যালিটির বিরুদ্ধে যদি অবশ্য সমস্ত বোর্ড মায়াঘাট সাপ্লাই কর্পোরেশনের ওপর মিউনিসিপালিটির ভার দিতে রাজী না হয়।

অবশ্য, কেদার সান্যাল জানতেন ভেতর থেকে ব্যবস্থা যে রকম পাকা হয়ে গেছে তাতে সমস্ত বোর্ড যে বিনা প্রতিবাদেই কেদার সান্যালের মুঠোর মধ্যে তুলে দেবে সমস্ত মিউনিসিপালিটি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এতদিন ধরে যে প্রতিবাদের বন্যা বয়ে চলেছিল শিবনাথের আদর্শের সূত্র ধরে, সে বন্যা হয় শুখিয়ে যাবে আর নয়ত শক্ত বাঁধের পাল্লায় পড়ে এমন পঙ্গু হয়ে যাবে যে তার অস্তিত্ব না থাকারই সমান হয়ে উঠবে! কথায় বলে জলেই জল বাঁধে আর এমন জলের মত টাকা খরচ করা হল যখন, তখন বন্যার জল বাঁধবে না কেন?

ভয় ছিল ভারতজ্যোতিকে। কিন্তু সে ভয়ের একেবারে শেকড় পর্যন্ত উপড়ে ফেলার ব্যবস্থা হয়েছে। শুধু কানাইকে নেশায় ভুলিয়ে হাত করা হয়নি, হাতিয়ার চালিয়ে গুঁড়িয়ে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে রাক্ষসের মত মেশিনটাকে!

তবু, এ কি অভাবনীয় ব্যাপার! সেই ভারতজ্যোতি বেরিয়ে গেল ঘড়ির কাঁটা ধরে সকাল সাতটায়! তার ওপর এই মানুষের ভীড়।

আর তাদের সবার আগে সেই হতভাগা ছোঁড়াটা যাকে সেদিন লাঠির ঘায়ে লুটিয়ে দেওয়া গেল রক্তের বন্যায়। আর ঐ সেই পুঁচকে এক ফোঁটা মেয়েটা যাকে জন্মের থেকে বড় হতে দেখা গেল চোখের ওপর! এর পরেও বিশ্বাস করতে বল নিজের চোখকে?

কেদার সান্যাল কাণ পেতে শুনতে লাগলেন পথের জনতার সেই কলরব। ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের বুকে দিশেহারা নাবিক যেমন করে শোনে প্রলয়ের তরঙ্গরোল। মৃত্যুর শতমুখ আহ্বান!

জনসাধারণের—

জয়!

ভারতজ্যোতির—

জয়!

আমাদের দাবী—

মানতে হবে!

মায়াঘাট সাপ্লাই কর্পোরেশন—

ধ্বংস হোক!

পুঁজি বাদ—

ধ্বংস হোক!

মিউনিসিপ্যালিটি—

আমাদের।

আমাদের দাবী—

মানতে হবে!

ইনক্লাব—

জিন্দাবাদ!

অস্ত্র নয়; শুধু কণ্ঠ! শুধু কণ্ঠ নয় নীলকণ্ঠের বিষ! শুধু বিষ নয় বিষের সমুদ্র!

সেই সমুদ্র থেকে প্রলয়-ক্ষুব্ধ মৃত্যুর আহ্বান আসছে!

নিরস্ত্র হলেও মৃত্যু মৃত্যুই!

আর, মৃত্যুর কি কোন দিন অস্ত্র দেখেছে কেউ?

তবু বলি দিতে হবে কি নিজেকে নীরবে ?

না, অন্যপথ জানা আছে কেদার সান্যালের! পিচ্ছিল হলেও সহজ, ঘোরালো হলেও জোরালো!

একটু অবাক হল বই কি সকলে! অবাক হল ইন্দ্রনাথ! বললে, আমাদের অপরাধ ?

ইনস্‌পেক্‌টর বললে, অপরাধ না থাকলে সখ্ করে আপনাদের গ্রেপ্তার করে আমাদের কোন লাভ নেই!

—সে ত' বুঝলুম গ্রেপ্তার করা আপনাদের সখ নয় পেশা! কিন্তু আমাদের অপরাধটা জানতে পারলে খুশী হতুম!

—অপরাধ—আপনারা অশিক্ষিত জনতার মধ্যে অন্যায় বিদ্রোহ ছড়াচ্ছেন···আইন আর শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে ক্ষেপাচ্ছেন···। আপনারা রাজদ্রোহী!

প্রয়োজন না থাকলেও ইনস্‌পেক্‌টর খুব জোর দিয়ে সকলকে শুনিয়ে কথাগুলে বলছিল। ইন্দ্রনাথ চট্ করে বললে, যাক, যা বলবার আস্তে বলবেন মিছামিছি ঐ লোকগুলোকে ক্ষেপিয়ে তুলে লাভ নেই।

ইনস্‌পেক্‌টর রীতিমত থতমত খেয়ে গেছে বোঝা গেল।

একটু থেমে ইন্দ্রনাথ বললে, বেশ, আমি যেতে রাজী আছি আপনার সঙ্গে কিন্তু ইনি, এঁকেও কি—

এই প্রথমবার ইন্দ্রনাথকে কথা সম্পূর্ণ করতে না দিয়ে বাধা দিয়ে বলে উঠলো শাস্তি, আমিও যেতে প্রস্তুত ইনস্‌পেক্‌টর বাবু!

ইন্দ্রনাথ চেয়ে দেখলে শাস্তির দিকে। তার নিজের কথাগুলোই নিজের কানে বাজছে: আপনার পথ কি আলাদা আমার পথ থেকে ?

নিরঙ্কুশ হয়ে স্বপ্ন দেখছেন কেদার সান্যাল। মিটিং আরম্ভ হতে আর দেরী নেই। অনেকেই এসে গেছে। যারা আসে নি এখনও তাদের জন্যে যা অপেক্ষা। অবশ্য মিটিংএর কোন প্রশ্নই ওঠে না। ফল যা হবে তা জানা আছে ভাল করে কেদারবাবুর। অঙ্কের বইতে

একেবারে পেছনের দিকে যেমন লেখা থাকে সংক্ষিপ্ত উত্তর কোনও গতিকে একবার উল্‌টে মিলিয়ে নিলেই হল। এমন কি আগে ফল দেখে নিয়ে ব্যাক ক্যালকুলেশন করে কোনও গতিকে মিলিয়ে দিতে পারলেই হয়।

স্বপ্ন দেখছেন কেদার সান্যাল অত বড় মেমোরিয়েল পার্ক হাতের মুঠোয় এসে গেল, তারপর উড়িয়ে গুঁড়ো করে দেওয়া গেল স্মৃতিমন্দির—যে মন্দির পার্কের ওপর নয়, কেদার সান্যালের বুকের ওপর বিঁধে আছে কাঁটার মত—আর সেই ধূলোর ওপর তৈরী হল কারখানা আর সেই কারখানার চিমনী দিয়ে ধোঁয়ার সঙ্গে ধোঁয়ার মতই মিলিয়ে গেল শিবনাথের আধিপত্যের শেষ স্মৃতিচিহ্ন। সকাল বিকেল তীক্ষ্ণ বাঁশী বেজে উঠলো কারখানায়। সেই ধ্বনি কেঁপে কেঁপে ছড়িয়ে পড়লো সমস্ত মায়াঘাটে—পিয়ালী নদীর খোলা বুকের খোলা হাওয়ার ঢেউয়ে ঢেউয়ে ছড়িয়ে গেল দূরে দূরে! ···আচ্ছা, সেই ধ্বনি কি ধাক্কা দেবে মধুবনীর হাওয়াকেও? কেদার সান্যাল মনে মনেই একনিষ্ঠ হয়ে কান পাতেন সেই বাঁশী শোনবার জন্যে! মিটিং হলের কলরব প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে তাঁর শ্রবণ থেকে: স্পর্শ করে না।

কিন্তু, কে জানতো ঘুম ভাঙ্গবে দামোদরের? প্রবল তোড়ে আলগা করে ধ্বসিয়ে দেবে বড় বড় বনিয়াদ? ···অবশ্য, খবর একটা এসেছিল—উড়ো খবর—যে দামোদরের উৎপত্তির মুখে জলের তোড় দেখা দিয়েছে। কিন্তু, তবু যখন সাবধান হয় নি বন্যা-পীড়িত দেশের মানুষ তখন, এখন তাতে ভেঙ্গে পড়লে দোষ দেবে কাকে?

উঠে দাঁড়ালো শোভনা। সমস্ত খবর আসছিল তার কাছে, ভারতজ্যোতি প্রেস ভাঙ্গার খবর···গ্রেপ্তারের খবর—। কিন্তু আসলে শোভনার খবরটাই রাখে নি কেউ। কেউ খেয়াল করে দেখে নি যে গ্রেপ্তারের খবর শোনবার সঙ্গে সঙ্গে শোভনা বেরিয়ে পড়েছে মধুবনীর তালুকের উদ্দেশ্যে, সোমনাথকে না বলেই। শোভনা বুঝেছে এই হল প্রকৃষ্ট সময় যখন নাকি তার গচ্ছিত ধন ইন্দ্রনাথকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে মায়াঘাটের সমস্ত পাপের ঋণ শোধ করতে হবে। আন্দোলন সুরু

করতে [illegible] আবার—আবার জাগাতে হবে বিপ্লব—যে বিপ্লবের বীজকে সে তুলে দিয়েছিল শিবনাথের হাতে—সেই ইন্দ্রনাথকে।

অবশ্য ইন্দ্রনাথকে নিয়ে ফিরতে পারলো না শোভনা। কেবল এই খবরটা নিয়ে ফিরলো যে ইন্দ্রনাথ ফিরেছে বহুদিন আগে সকলের অজ্ঞাতে, রক্তাপ্লুত দেহে দেখা দিয়ে গেছে তাকে আর সেই ইন্দ্রনাথই খানিক আগে বরণ করে নিয়েছে কারাগার!

তাহলে কেদার সান্যালের চক্রান্তের বিরুদ্ধে মায়াঘাটকে রক্ষা করতে কে দাঁড়াবে? প্রতারিত উৎপীড়িত মূঢ় মূকদের হয়ে কার কণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে উঠবে?

ইন্দ্রনাথ আর তার দলবল সমস্ত কারা প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ। কেদার সান্যালের নাগপাশ সমস্ত মায়াঘাটকে মৃত্যু বন্ধনে জড়িয়ে ধরতে উদ্যত।

সভা বসতে এখনো কিছু দেরী আছে। কেদার সান্যাল বিজয় লাভ সুনিশ্চিত জেনে আগে থাকতেই হল ঘরে সমবেত হয়েছেন সদল বলে।

হঠাৎ বাহিরে একটা শোরগোল শোনা গেল। ব্যাপার কি? কেদার সান্যাল আরো অনেকের মত মুখ ফিরিয়ে তাকালেন কৌতূহলী হয়ে।

শোভনা আসছে মিউনিসিপ্যাল হলে, আর তার পেছনে, কে উনি!

এখনো মায়াঘাটে এমন অনেকে আছে যারা ওই সৌম্য তেজোময় মূর্ত্তি বিস্মৃত হয়নি। একটা চাপা গুঞ্জন হলের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ছড়িয়ে গেল। স্তব্ধ নিষ্কম্প অরণ্যে ঝটিকার মেঘের প্রথম সংবাদ যেন এসেছে।

শিবনাথ! শিবনাথ!—কাণে কাণে নামটা সকলের মাঝে সঞ্চারিত হয়ে গেল।

অশীতিপর শীর্ণ দেহ শিবনাথ বয়সের ভারে একটু নুয়ে পড়েছেন, চলতে একটু পা কাঁপে, কিন্তু মুখে সেই অনির্ব্বাণ শিখার দীপ্তি।

ভাই সব!—স্তব্ধ সভায় শিবনাথের কম্পিত কণ্ঠ শোনা গেল—কম্পিত কিন্তু ক্ষীণ নয়। "ভাই সব! এ সভায় আজ আমার প্রবেশের

অধিকার নেই। তবু এই আশা নিয়ে আজ আমি এখানে এসেছি যে আপনাদের সভার সত্যকার অধিবেশন সুরু হবার আগে আমায় দুটো কথা বলবার সুযোগ আপনারা দেবেন……

"না, না, এখানে কোন কথা বলবার অধিকার আপনার নেই!"—কেদার সান্যাল প্রথমটা কেমন অভিভূত হয়ে গেছলেন, এবার যেন চাবুকের আঘাত পেয়ে চীৎকার করে প্রতিবাদ জানালেন।

শিবনাথের মুখে কিন্তু কোন চাঞ্চল্য নেই। শান্ত স্মিত মুখে সভার দিকে তাকিয়ে তিনি বল্লেন, "আইনতঃ কোন অধিকার আমার নেই একথা আমি মানি। কিন্তু যে আইনের কাছে নয়, কিন্তু সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্যে আইন স্বষ্টি করার দায়িত্ব ও অধিকার যাদের হাতে আছে তাদের কাছেই আমার অনুরোধ আমি জানাচ্ছি। আইন যখন নিজের সার্থকতা হারিয়ে সত্যের কণ্ঠরোধের অস্ত্র হয়ে দাঁড়ায় তখন তা ভেঙে নতুন করবার অধিকার আপনাদেরই—আইনের যাঁরা স্রষ্টা। আপনাদের অনুমতির অপেক্ষাতে তাই আমি দাঁড়িয়ে আছি……"

অসংখ্য কণ্ঠের স্বতস্ফূর্ত্ত রোল উঠল…"হ্যাঁ আমরা শুনতে চাই, আপনার কথা শুনতে চাই…"

কেদার সান্যাল বিমূঢ় হয়ে চারিদিকে তাকালেন। নিষ্কম্প অরণ্য এ কোন বাত্যাবেগে আন্দোলিত হয়ে উঠেছে? এরকম একটা সম্ভাবনার কথা তিনি ভাবতেই পারেন নি।

"ভাই সব!" অশীতিপর বৃদ্ধের দুর্ব্বল কণ্ঠে একি বজ্র নির্ঘোষ!

"ভাই সব, আমার মত আরো কয়েকজনের সঙ্গে প্রায় ষাট বছর আগে একদিন এই মায়াঘাটের এক আশ্চর্য স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম। এমন এক নগর বসাতে চেয়েছিলাম, যেখানে মানুষ মাথা উঁচু করে তাকাতে ভয় পায় না, লোভ, হিংসা, স্বার্থপরতা যেখানে মানুষের জন্মগত অধিকার অন্যায় ভাবে গ্রাস করে রাখে না, প্রত্যেক মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশের পথ যেখানে মুক্ত। অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি যে, সে স্বপ্ন সফল করতে না পেরে একদিন গভীর হতাশা নিয়ে

এখান থেকে আমি বিদায় নিয়ে গেছলাম। আজ মৃত্যুর প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে আমি বুঝেছি সেই বিদায় নেওয়া আমার জীবনের এক পরম কলঙ্ক। আজ আমি জানি কোন সত্যকার আদর্শের স্বপ্নই কোনদিন ব্যর্থ বলে বর্জন করবার নয়। আমাদের যুগে স্বপ্ন আমরা সফল করে তুলতে পারিনি, আপনাদের এবং সমস্ত ভাবীকালের চোখে তারই জ্যোতির্ময় ইঙ্গিত আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আমি দেখতে পাচ্ছি মানুষের অন্তরের স্বপ্নকে বাস্তব করে তোলার সংগ্রাম যুগ যুগ ধরে আজ পর্যন্ত চলে আসছে। সে সংগ্রামে সাময়িক পরাজয় আছে পদস্খলন আছে, কিন্তু হার মেনে হাল ছেড়ে দেওয়ার কোন অবসর নেই। লোভ ও হিংসা, নীচতা ও স্বার্থপরতা, মানুষের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথ রোধ করে যা কিছু অন্যায় অবিচার সদম্ভে দাঁড়িয়ে আছে, তার বিরুদ্ধে চিরন্তন সংগ্রামে তাই আমি আপনাদের আহ্বান করতে এসেছি।

আমাদের মায়াঘাটে মানুষের মুক্তি সংগ্রামের অতি সামান্য একটু অংশ অভিনীত হচ্ছে মাত্র। তবু এই মায়াঘাট আজ সমগ্র পৃথিবীর প্রতীক। অন্যায়ের কাছে যতটুকু মাথা হেঁট আমরা করব, আদর্শের সংগ্রামে পৃথিবীর সমস্ত সংশপ্তক বাহিনীর মাথা ততখানি হেঁট হবে। যে মিথ্যাকে নিজেদের দুর্ব্বলতায় ও ভীরুতায় আমরা স্বীকার করে নেব, সমস্ত মানুষের ইতিহাসকে তা কলঙ্কিত করে দেবে।

সূর্য্যের আলো ও আকাশের মুক্ত বায়ুর মত এই মায়াঘাটের মাটির প্রত্যেকটি কণা আপনাদের সকলের, কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠি বিশেষের নয়। এ মায়াঘাটের মাটিকে নিজেদের আদর্শে গড়ে তোলবার অধিকার কোন প্রলোভনে, কোন উৎপীড়নের ভয়েই বিসর্জন দেবার নয়।

মায়াঘাটের পৌর সভায় কর্ত্তৃত্ব অপরের হাতে আপনারা নাকি তুলে দিতে চান। এ কথা সত্য বলে বিশ্বাস করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। গভীর লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি যে আমাদের দেশের ইতিহাসে এরকম কলঙ্কময় আত্ম-বিক্রয়ের দৃষ্টান্ত একেবারে বিরল নয়। কিন্তু

আমাদের জাতীয় চেতনা কি এতদিনেও উদ্বুদ্ধ হয়নি! তুচ্ছ সাময়িক স্বার্থের লোভে, কিম্বা প্রবলের আস্ফালনের ভয়ে নিজের জননী ও জন্মভূমিকে পরের হাতে আমরা কি স্বেচ্ছায় তুলে দিতে পারি?

সমস্ত বিরাট হল ঘর কম্পিত করে অসংখ্য কণ্ঠের প্রতিবাদ ধ্বনিত হ'ল—না, না কখনো না!

অশীতিপর বৃদ্ধের জীবনের সুদীর্ঘ পথ-পর্যটন-ক্লান্ত ঈষৎ নত শির বি যৌবনের উৎসাহে আমার সোজা হয়ে উঠেছে! শিবনাথ আবার সুর করলেন, 'সত্যের জন্যে ন্যায়ের জন্যে মানুষের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্যে পৃথিবী ব্যাপী যে সংগ্রাম চলেছে, আপনারা তার সামান্য একটু অংশ বহন করছেন মাত্র, তবু যে মুক্তি-মন্ত্র স্বাক্ষরিত পতাকা আপনাদের হাতে আছে সমগ্র মানবজাতির আশা ও স্বপ্ন তার মধ্যে প্রতিবিম্বিত আছে। তা বারেকের জন্য নোয়ালেও জীবনের সমস্ত আদর্শ অপমানিত লাঞ্ছিত হবে। তাদের কথা আজ আপনাদের স্মরণ করতে বলি, যুগে যুগে এই সংগ্রামে যারা জীবন বলি দিয়েছে, আজো যারা দিচ্ছে। এই ম াটেই সত্যের জন্য আদর্শের জন্য বহু নির্ভীক প্রাণ আজ বন্দী। তাদের পায়ে আজ কঠিন শৃঙ্খল, কিন্তু যে পথের দিশা তারা দিয়ে গেছে তার আহ্বান কিছুতেই স্তব্ধ হবার নয়। সে আহ্বান কি হৃদয়ের মধ্যে আপনারা শুনতে পাচ্ছেন না? দুর্যোগের তিমির রাত্রির ওপারে জ্যোতির্ম্ময় ভবিষ্যতের নবারুণরাগ কি আপনাদের চঞ্চল করে তোলেনি?

সভাগৃহে যেন সমুদ্র কল্লোল ধ্বনিত হয়ে উঠল। অসংখ্য উৎসাহ দীপ্ত কণ্ঠের কলরোল। বিশাল ঘরে আর তিল ধারণের স্থান নেই। সমস্ত নগর ভেঙে বুঝি জনতা এখানে এসে জড় হয়েছে। মুখে মুখে খবর গেছে ছড়িয়ে। শিবনাথ এসেছেন, শিবনাথ, ঋষি প্রতিম মায়াঘাটের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। কোন বাধা কেউ আর মানে নি।

এই জনতার মাঝে কোথায় কেদার সান্যাল, আর তাঁর অনু বৃন্দ? হয়ত হারিয়ে গেছেন! কিন্তু অশুভ ও অন্যায়ের বীজ এ